ধর্ম ও কুসংস্কার

DHARMA O KUSANSKAR
(Religion And Superstition)
By Sudhakar Chattopadhyay
September, 1963

পরিবেশক
চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড
৭৭/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

শ্রীঅরুণকুমার রায় কর্তৃক ৭৭/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং
শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত কর্তৃক নবশক্তি প্রেস, ১২৩ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা
থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ : সজল রায়।

ইচ্ছা ছিল বইটা বেরুলে শ্রদ্ধেয় **শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীর** (গোসাইজীর) হাতে সমর্পণ করব। রোগশয্যাতেও তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, ছাপা কতদূর এগুলো। বইটা বেরিয়েছে। তিনি কিন্তু ইতিপূর্বেই ইতিহাসের পাতায় স্থান নিয়েছেন। মনে সেই ব্যথা নিয়ে এটি তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে সমর্পণ করলুম।

আজকে তুমি মর্ত্যলোকে থাকো বা নাই থাকো।
আমার প্রণাম অর্ঘ্য কভু বৃথায় যাবে নাকো॥

শ্রীঅরুণকুমা.
শ্রীরণজিৎকুমা

ভূমিকা

সব যুগে এবং সব জাতির মধ্যে দেখা যায় যে ধর্মকে কেন্দ্র করে কতকগুলি কুসংস্কার ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের ধর্ম এর বিপরীত নয়। কালক্রমে এই সব কুসংস্কারই হয়েছে মুখ্য এবং প্রকৃত ধর্ম হয়েছে গৌণ। সমাজে যাঁরা ধর্মের বিধানদাতা, তাঁরা দিয়েছেন কেবল কুসংস্কারেরই বিধান।

এই রকম কতকগুলি কুসংস্কারের আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি এ পুস্তকে। এগুলি প্রবন্ধাকারে বেরিয়েছিল 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায়। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে এই রকম কয়েকটি প্রবন্ধ লেখার পর চিন্তাস্রোতে একটু ভাঁটা পড়েছিল। তখন 'চতুষ্কোণে'র সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীশিবপ্রসাদ চক্রবর্তী তাগাদা দিয়ে সেই স্রোতে জোয়ার এনেছিলেন। তাই এই সুযোগ গ্রহণ করছি তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবার। এশিয়ার আদিম ধর্মের উপর প্রবন্ধ লিখেছিলুম 'দেশ' পত্রিকায়। সেটি অপরিবর্তিতভাবে 'পরিশিষ্ট খ' রূপে পুস্তকে স্থান দিয়েছি। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদককে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রবন্ধগুলি পড়ে একজন দার্শনিক বন্ধু প্রশ্ন করেন, আপনি ধর্ম এবং কুসংস্কার বলতে কি বোঝাতে চান? তাঁর প্রশ্নের জবাব পুস্তকের শেষে উপসংহারে দেবার চেষ্টা করেছি। কতদূর সফল হয়েছি, সে বিচারের ভার তাঁর উপরেই ছেড়ে দিলুম।

আর একজন ঐতিহাসিক বন্ধুর প্রশ্ন, আমি কেন এক জায়গায় বিষ্ণুস্মৃতিকে মনুস্মৃতির পূর্বে স্থান দিয়েছি। মতভেদ এখানে থেকেই যাবে, কারণ Buhler, Jolly, Kane প্রভৃতি পণ্ডিতগণও এ বিষয়ে একমত নন। কোন কোন তত্ত্ববিদ মনে করেন যে, মনুস্মৃতি এবং বিষ্ণুস্মৃতি—এ দুয়েরই মূল অংশ সুপ্রাচীন হলেও পরবর্তী যুগে কিছু শ্লোক সংযোজিত হয়েছে। Buhlerএর মতে এটা মনুস্মৃতি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন যে বিষ্ণুস্মৃতি 'shows no traces of recasting and may be reasonably supposed to faithfully represent the original

Dharma-Sūtra'. (SBE. xx, xxiii) ঐতিহাসিক বন্ধু সন্তুষ্ট হবেন কিনা জানি না। হয়ত আমার ভবিষ্যৎ ধিক্কার তোলা রইল।

আমার কাজে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি ডঃ শ্রীমতী লতিকা চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। প্রুফ দেখার কাজে সাহায্য করেছে পুত্র অভিজিৎ।

পাঠকদের হাতে আজ বইটিকে তুলে দিলুম। পুরস্কার এবং তিরস্কার তাঁদেরই বিচার্য।

সুধাকর চট্টোপাধ্যায়

বিষয়সূচী

গোড়ার কথা

মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন সে জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং ভাবে যে সে কি চেয়েছিল এবং কি পেয়েছে অথবা যা চেয়েছিল তার কতটুকুই বা পেয়েছে। পাল্লার একধারে চাওয়া, আর একধারে পাওয়া। এই চাওয়া এবং পাওয়ার পাল্লা ধরেই জীবনটা এগিয়ে চলেছে। মানুষের কামনা-বাসনার অন্ত নেই, অথচ পাওয়াটা পরিমিত। তাই মানুষের হতাশায় ভেঙে পড়াটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু মানুষের মধ্যে যদি এই চাওয়া এবং পাওয়াটা না থাকত, অথবা মানুষ যা পেয়েছে তাই নিয়েই যদি তৃপ্ত হত, তাহলে জগৎটা হত অন্য রকমের। হ্যাঁ, অনেকেই বলবেন যে জীবনের অনেক ঝঞ্ঝাটই আজ থাকত না। এই চাওয়া-পাওয়া নিয়েই মানুষে মানুষে সংগ্রাম, জাতিতে জাতিতে হানাহানি। যাঁরা আজ nationalism ছেড়ে internationalism-এর কথা বলেন, তাঁদের মধ্যেও বিতণ্ডা internationalism-এর পথ নিয়ে। এখানেও পথকে কেন্দ্র করে চাওয়া এবং পাওয়ার বিরোধ। কাজেই এই পাল্লাটাকে ছুঁড়ে না ফেলে দিতে পারলে জীবনযুদ্ধে শান্তি নেই।

কিন্তু যদি এই বিরোধটা না থাকত, মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন তাহলে জগতে কোনও মহৎ কাজই হত না। এই অতৃপ্ত বাসনাকে কেন্দ্র করেই জগতে নূতন নূতন আবিষ্কার, জগতে নূতন নূতন সত্যের সূচনা। এটা চিরসত্য, তাই জগৎ চিরগতিশীল; এটাই জড়ত্ব আসতে দেয় না। এই অতৃপ্ত বাসনার আর একটা রূপ ধর্ম এবং গৌণভাবে পরলোকে বিশ্বাস। মানুষ যখন দেখে যে তার জীবন বিফলতায় পর্যবসিত হতে যাচ্ছে, হয় সে ভাবতে ভাবতে উন্মাদ হয়ে যায়, আত্মহত্যা করে, অথবা জীবনের ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর অভিযান শুরু করে যেটা চুরি, ডাকাতি, খুন ইত্যাদির অসামাজিক রূপ নেয়। অপরপক্ষে, অনেকে এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিতে শুরু করে যে এটা ছাড়া আরও একটা কিছু আছে, যাকে আশ্রয় করতে পারলে জীবনের সব কিছুই পূর্ণ হবে। এই অজানাকে খোঁজার প্রয়াস ধর্মের মূল উৎস। যাঁরা মনে

করেন যে ভয় অথবা বিস্ময় থেকেই ধর্মের উৎপত্তি, তাঁরাও কিন্তু ঘুরিয়ে এই চাওয়া-পাওয়ার পাল্লাটাকে স্বীকার করেছেন। ভয় দাঁড়ায় ভবিষ্যৎ আশার পথ রোধ করে, আর বিস্ময় খুলে দেয় নূতন আশার পথ।

আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি যাই ধর্মের কারণ হোক, ধর্মের একটা অদ্ভুত গতি রয়েছে। এটা সেকালেও যেমন সত্য একালেও তেমনি। এর বাইরের রূপ দেশে দেশে যুগে যুগে ভিন্ন হলেও, এটা বইছে চিরদিন একই ধারায়। এই স্রোতস্বিনীর এধারে একরকম রূপ, ওধারে আর একরকম, কিন্তু সেটা চিরকালেরই। যখন কোনও মহাপুরুষ একটা মতবাদের বা ধর্মের প্রবর্তন করেন, তখন সেটা সজীব, প্রাণবন্ত, প্রবহশীল; কিন্তু কালক্রমে এর রূপ যায় বদলে। তখন এই স্রোতস্বিনীর স্রোত থেমে যায়, এটা হয়ে যায় একটা বদ্ধ পঙ্কিল জলাশয়। বেশির ভাগ লোক এই পঙ্ককেই মনে করে পবিত্র বস্তু, এর সাহায্যেই তারা তাদের চাওয়া-পাওয়ার দাঁড়ির কাঁটা ঠিক করতে চায়। ফলে, কিছুদিন পরে আসে ব্যর্থতা এবং হাহাকার। তখন এরা পথকে আঁকড়ে ধরে, রথকে আঁকড়ে ধরে, নিষ্প্রাণ মূর্তিকে আঁকড়ে ধরে, হ্যাঁ, হয়ত অন্তর্যামী একটু হাসেন।

অন্য দেশের কথা ছেড়ে শুধু যদি আমরা ভারতের ধর্মের দিকেই তাকাই, তাহলেই দেখতে পাব যে এক একটি মহান মতবাদ যা মহাপুরুষদের কেন্দ্র করে প্রবর্তিত হয়েছে, কিভাবে তা পরবর্তী যুগে কতকগুলি সংস্কার বা কুসংস্কারে পরিণত হয়েছে। হয়ত, কালক্রমে মানুষের যেমন জরা আসে, সেই রকম সব জিনিসেই, তা সে ধর্মই হোক, সামাজিক জীবনই হোক বা অন্য কিছুই হোক, একটা জরা এসে উপস্থিত হয়। তখন এর উদ্দাম প্রাণজ্যোতি কমে আসে, খানিকটা অন্ধকার এসে তাকে ঘিরে ফেলে। এই যদি প্রকৃতির নিয়ম হয়,—কিছু বলবার নেই, কারণ তা হবেই, তা রোধ করা যাবে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা দেখি যে ধর্ম অভ্যাস ও সংস্কারে পরিণত হয়, তা সে আদিতে যতই মহৎ দীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন। সব চেয়ে একটি মহান এবং গরিমাময় ধর্মের কথা ধরা যাক। তথাগত দেখলেন যে তাঁর সময়ের যে প্রচলিত ধর্ম তা কতকগুলি সংস্কারের সমষ্টিমাত্র। তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন ফুরিয়ে গেছে, ধর্মের কোন ছাপই নেই। তিনি একটা প্রাণবন্ত ধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেন যাকে আশ্রয় করে মানুষ চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে উঠবে, প্রকৃত শান্তি পাবে। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে মহামতি অশোক

কলিঙ্গ জয় করে কলিঙ্গের মাটিতে রক্তের স্রোত প্রবাহিত দেখে মর্মাহত হয়ে ভেঙে পড়েন। তিনি কলিঙ্গরাজ্য জয় করতে চেয়েছিলেন, জয় করলেন। কিন্তু তিনি কি শান্তি পেলেন? তাঁর হৃদয়ে এল এক দৈন্য এবং হাহাকার। তখন তিনি তথাগতের ধর্মে দীক্ষিত হলেন। তিনি বুঝলেন চাওয়ার মধ্যে শান্তি নেই, পাওয়ার মধ্যে শান্তি নেই। যার মধ্যে শান্তি আছে তিনি তা পেয়েছেন, পরিতৃপ্ত হয়েছেন। এ অমৃত তিনি বিলিয়ে দিতে চান সবার মধ্যে। তিনি যে ধর্ম প্রচার করলেন সেটা কিন্তু পুরো বৌদ্ধধর্ম নয়। বোধহয় তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে সে ধর্মেও খানিকটা সংস্কার ঢুকেছে। তাই তিনি বৌদ্ধধর্মের সার কথা প্রচার করতে লাগলেন। সংস্কার ছেড়ে গভীরে প্রবেশ করে দেখলেন, সব ধর্মের সার কথাই এক, ভিতরে সবারই স্বচ্ছ পানীয়। মারামারি কেবল উপরের ছোবড়াটা নিয়ে। এই সারকথা তিনি প্রচার করলেন দেশে তাঁর লিপি এবং ধর্মমহামাত্র মারফত এবং বিদেশে ধর্মমহামাত্র পাঠিয়ে। সিংহলের প্রাচীন পালি পুস্তক দীপবংস (অ: ৮) এবং মহাবংস (অ: ১২) থেকে আমরা জানতে পারি যে অশোক তাঁর ধর্ম প্রচারের জন্যে কাশ্মীর, গন্ধার (পেশওয়ার জেলা), মহিষমণ্ডল (মহীশূর), বনবাসী (উত্তর কানাড়া), অপরান্ত, মহারাষ্ট্র, যোন (ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গ্রীক উপনিবেশ, হিমালয়ের অন্তর্বর্তী দেশ), সুবর্ণভূমি (ব্রহ্মদেশ) এবং লঙ্কায় তাঁর দূত প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর ত্রয়োদশ শিলালিপি (Rock Edict) থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি ভারতের বাহিরে কয়েকটি রাজদরবারেও তাঁর বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন। সে সব রাজারা হলেন—

Syriaর	রাজা	Antiochos II Theos (অংতিয়োক) (261-246 B.C.)
Egyptএর	রাজা	Ptolemy II Philadelphos (তুরুময়) (285-247 B.C.)
Mecedoniaর	রাজা	Antigonus Gonatas (অংতিকিনি) (276-239 B.C.)
Cyreneএর	রাজা	Magas (মক) (C. 285-258 B.C.)
Epirusএর	রাজা	Alexander (অলিকসুন্দর) (272-C. 255 B.C.)

তাঁর দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ শিলালিপি থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে এ ছাড়া তিনি চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র, যোন, কম্বোজ, ভোজ, অন্ধ্র, পুলিন্দ এবং তাঁর 'রাজবিষয়ের' অন্যান্য দেশে ও তাম্রপর্ণী বা লঙ্কায় ধর্মমহামাত্র পাঠিয়েছিলেন।

এই যে এত বড় মহান ধর্ম যা দেশ-বিদেশ প্লাবিত করেছিল, ক্রমে ক্রমে এর নূতন রূপ এল। এই নূতন রূপটি আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই খ্রীঃ প্রথম শতকে; নূতন নাম 'মহাযান' এবং পূর্বের যে ধর্ম সেটাকে বলা হল 'হীনযান'। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রাচীনের এত বড় বিদ্রূপ আমরা বোধহয় আর কোথায়ও দেখতে পাই না। ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে Martin Luther প্রভৃতির যে বিদ্রোহ, তার মধ্যেও প্রাচীনকে এভাবে ব্যঙ্গ করা হয়নি। যাই হোক, কালক্রমে এই 'মহাযান' তার মহত্ত্ব হারিয়ে আশ্রয় নেয় কতকগুলি তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে। তথাগতের উদার শিক্ষা দূরে ফেলে কদর্য এবং কুৎসিত আচারাদি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদের ব্যভিচার বিভিন্ন বিহারে চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত একদা-মহান এই ধর্ম তার জন্মভূমিতেই সকল মর্যাদা থেকে চ্যুত হয়।

ইচ্ছা করেই বৌদ্ধধর্মের বিষয়টা আমরা বেছে নিয়েছি, কারণ তার উৎপত্তি এক অতি পবিত্র পরিবেশে এবং মহাপ্রাণের আদর্শে, যেখানে কুসংস্কারের আদৌ স্থান ছিল না। কিন্তু কালক্রমে এর এই পরিণতি। হিন্দু-ধর্মের মধ্যে কুসংস্কার থাকবেই, কারণ এই ধর্মের প্রবর্তক কেউ নেই, এটা ভারতবাসীর মধ্যে আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে। এটাকে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র people's religion বলা যায়। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্তর, এর মধ্যেও বিভিন্ন স্তর। এক স্তরকে কেন্দ্র করে যেমন একদিকে নূতন নূতন দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি, তেমনি এর আর এক স্তরে স্বভাবতই পুঞ্জীভূত হয়ে আছে অসংখ্য কুসংস্কার। যদি কেউ বলেন যে হিন্দু-ধর্মের মত মহান তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত খুব কম ধর্মই দেখা যায় এবং দেখিয়ে দেন তার বড় দর্শনকে—সেটা যেমন একটা একপেশে মত, তেমনি যদি কেউ বলেন যে হিন্দুধর্মের মধ্যে কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নেই, সে মতটাও একপেশে। দার্শনিক মতবাদ এবং কুসংস্কার পাশাপাশি চলেছে এবং বোধহয় চলবেও। মাঝে মাঝে এক একজন মহাপুরুষ এসে একে খানিকটা সংস্কার করেন, একটা নূতন মতবাদের ও ধারার প্রবর্তন করেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই

এর অন্য রূপ দেখা যায়, কারণ এসব মহাপুরুষদের বাণী মানুষের সব স্তরে সমানভাবে গিয়ে পৌছায় না।

তাই হিন্দুধর্মকে ছেড়ে দিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি সেই সব ধর্ম বা মতবাদকে নিয়ে, যার প্রতিষ্ঠা শিক্ষিতদের মধ্যে, যাঁরা নিজেদের সংস্কারমুক্ত বলে দাবী করেন এবং হিন্দুধর্ম তথা সমাজের কুসংস্কার দূর করবার জন্যই যে সব ধর্মের উৎপত্তি। অন্তত দুটি এরকম মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদের মাধ্যমে। কিন্তু আজ এই বিংশ শতাব্দীতে সে সব মতবাদের কি অবস্থা। ঠিক পূর্বে যেমন করে, যেমন রীতিতে, যেমন ভঙ্গীতে পূজা প্রার্থনা হত তাই করতে হবে, তার ব্যতিক্রম চলবে না। সেইরকমভাবে চুপ করে চোখ বুজে বসতে হবে, নতুবা পরমপিতার আরাধনা হবে না। যাঁরা হোম করেন তাঁদের পূর্ব-নির্ধারিত মশলায় হোম করতে হবে, অন্য পথ নেই। সংস্কার ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে; আজ এখানেও হয়েছে সংস্কারের জয়, হয়ত সে সংস্কারটা একটু মার্জিত রুচির ও সুধী সমাজের।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। সংস্কারই ধীরে ধীরে সকল সমাজকে গ্রাস করে। যেটা ছিল গৌণ, সেটা হয় মুখ্য, আর যা মুখ্য তা হয়ে যায় গৌণ। ধর্মের মধ্যে কিছু সংস্কার থাকবেই এবং হয়ত তার প্রয়োজনও আছে। সংস্কার সাধারণ জীবনটাকে একটা নিয়মের মধ্যে নিয়ে যায়, উচ্ছৃঙ্খলতার পথ রোধ করে। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারের অর্গল যদি আসল দ্বারে গিয়ে পড়ে, তখনই হয় বিপত্তি। তখন আমরা বিকৃত সংস্কারের দাস হই এবং সোনা ফেলে দিয়ে আঁচলে গেরো বাঁধি।

এই সংস্কারকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে—জ্ঞানীর সংস্কার, ভক্তের সংস্কার, কামনা-বাসনা-কেন্দ্রিক সংস্কার। জ্ঞানীরাও কতকগুলি সংস্কার অনুসরণ করেন। পতঞ্জলি তাঁর 'যোগসূত্রে' অনেক নিয়মের কথা বলেছেন যেগুলি চিত্তবৃত্তি নিরোধের পথে সাহায্য করে। (শৌচসন্তোষতপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ, যোগসূত্র, ২, ৩২) এগুলিকে মোটামুটিভাবে সংস্কারই বলা যায়, কিন্তু এর ভিত্তি হলো দর্শন বা প্রকৃষ্ট জ্ঞান, তাই এ সংস্কার-গুলি জ্ঞান-কেন্দ্রিক। পত্র, পুষ্প, জল দিয়ে ভক্তরা তাঁদের দেবতার আরাধনা করে থাকেন। এ সাধনা গীতার অভিমত (গীতা, ৯, ২৬)। এগুলি ভক্তি বা শ্রদ্ধাকেন্দ্রিক। এই শ্রদ্ধাই ধীরে ধীরে সাধককে জ্ঞানের পথে নিয়ে যায়,

'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'। যাঁরা কেবল 'ধনং দেহি রূপং দেহি' ইত্যাদি বলে পূজা এবং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁদের চাওয়ার ফর্দ পেশ করে চলেন, তাঁদের সংস্কার হল 'বাসনা-কেন্দ্রিক'।

অনেক ক্ষেত্রেই ভক্তি এবং বাসনার তথা ভক্তি এবং জ্ঞানের সংমিশ্রণ দেখা যায়। কিন্তু যে শ্রেণীর সংস্কারই হোক যদি তার মধ্যে গোঁড়ামি থাকে, তখন সেটা ধীরে ধীরে কুসংস্কারে পরিণত হয়। ইতিহাসের নজীর দেখলে এই কুসংস্কার কত জঘন্য এবং নৃশংস ধরনের হতে পারে, তা ভাবতেও কুণ্ঠা বোধ হয়। মনে হয় এমন ধর্মের প্রয়োজন কি ?

কয়েকটি উদাহরণ নিলেই বোঝা যাবে।

মারণ উচাটন বশীকরণ ইত্যাদি

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের "বৃহৎ তন্ত্রসার" বইটি পাঠ করলে দেখা যায় যে বিভিন্ন জাগতিক উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন দেবদেবীর প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন, কোনটি ধনলাভের আশায়, কোনটি শত্রুনিধনের জন্য, কোনটি স্বাস্থ্যলাভেব ব্যাপারে ইত্যাদি। সর্ববিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্র এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়া। এখানে একটা প্রশ্ন স্বভাবত মনে আসতে পারে, যে তন্ত্রসাধনা মারফৎ আমাদেব দেশেব মহাপুরুষরা পরম নির্বাণের পথে এগিয়ে গেছেন, সেই তন্ত্র-শাস্ত্রে এই সব মারণ উচাটন বশীকরণ প্রভৃতি নিকৃষ্ট স্তরের জিনিস কি করে সন্নিবেশিত হল? তান্ত্রিক বললেই আজ আমাদের মনে একটা ভয়ের সঞ্চার হয়, তাঁকে আমরা এড়িয়ে যেতে চাই, কারণ ভয় হয় কি অমঙ্গল তিনি সাধন করে বসেন; যদি বা ভয় ভেঙ্গে যায় তখন তাঁর কাছে করজোড়ে দাঁড়াই, তিনি যদি সদয় হয়ে মন্ত্রপ্রয়োগে আমার সৌভাগ্যের বন্ধ দরজার কুঞ্চিকাটি খুলে দেন।

তন্ত্রের মধ্যে আমরা তাহলে দুটি জিনিস পাশাপাশি দেখি—একটি সাধন-মার্গ এবং আর একটি প্রয়োগমার্গ। এই পাশাপাশি দুটি বিপরীতধর্মী মার্গের একই শাস্ত্রে অবস্থানের কথা বুঝতে হলে আমাদের পিছনের ইতিহাসের দিকে একটু তাকাতে হয়। আমাদের সব ধর্মের উৎসই হল বেদ, অন্তত এই রকমই মনে করা হয়। বেদবিরোধী বলেই বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মকে এবং চার্বাক-মতাবলম্বীদেরও নাস্তিক বলা হয়েছে। এখানে নাস্তিক মানে নিরীশ্বর-বাদিতা নয়, কারণ তাহলে সাংখ্যদর্শনও নাস্তিক পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়, যেহেতু এর মধ্যেও ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। বেদ হল চারটি, ঋক্ সাম যজুঃ এবং অথর্ব। অথর্ববেদকে প্রাচীন ঋষিরা মর্যাদা দিতে চাইতেন না, বেদ অর্থে তাঁরা ত্রয়ী শব্দটির ব্যবহার করতেন। তাঁদের মতে প্রথম তিনটি বেদ পর্যায়-ভুক্ত, অথর্ববেদ এ পর্যায়ের নয়। ঋষিদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঠিক কারণ যদিও নির্ণয় করা শক্ত, তাহলেও এটুকু বোঝা যায় যে অথর্ববেদ মারণ উচাটন বশীকরণ প্রভৃতি মন্ত্রে পূর্ণ, তাই একে ঠিক সাধনপথের সহায়ক বলে গণ্য করা হত না। ঋগ্বেদের মধ্যেও আমরা জাগতিক উদ্দেশ্যে দেবতার

কাছে অনেক প্রার্থনা দেখতে পাই। কিন্তু সেখানে শুধু প্রার্থনা, অথর্ববেদের মধ্যে প্রয়োগ। হয়ত এই কারণেই অথর্ববেদ গোঁড়া সমাজে স্থান লাভ করতে পারেনি। আরও একটা কারণ আছে। প্রথম তিনটি বেদ সোম-যজ্ঞকে কেন্দ্র করেই লেখা হয়েছিল। কিন্তু অথর্ববেদের মধ্যে সোমযজ্ঞের বিশেষ গুরুত্ব নেই। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে অথর্ববেদের মধ্যে আমরা আর্যেতর জাতির অনেক মালমশলা পাই। তাই একে হীনচক্ষে দেখা হত। অথর্ববেদে অদ্বিতীয় পণ্ডিত অধ্যাপক M. Bloomfield কিন্তু এমত সম্পূর্ণ মেনে নিতে রাজী নন। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন :

"It has been assumed that the more intimate blending of the Vedic people with the barbarous aborigines of India may have contributed much to the vulgarization of the beliefs and literature of the Vedic Hindus. This is certainly true to some extent, but it does not account for a literature of such extent and character as the Atharvan. This is, after all, only to a limited extent suggestive of aboriginal barbarism ; demonolatry with all other things that are hideous and uncanny make up only a part of the AV and the related grhya-literature ; nor is it possible to demonstrate that even all that borrowed from outside sources. Contrariwise, Atharvanic charms are often pervaded by a more genuine 'Aryan' spirit than the more artistic prayers to the gods of the Rigvedic pantheon."

(*The Artharvaveda*, P. 2)

অথর্ববেদের অপ্রিয়তার কারণ তাহলে তিনটি ; এটি সোমকেন্দ্রিক নয়, প্রয়োগবিধি এর মধ্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে এবং আর্যেতর অনেক জিনিস এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। শেষ দুটিকে আমরা একই পর্যায়ে ফেলতে পারি, কারণ নৃতত্ত্ববিদরা বিশ্বাস করেন যে আমাদের শাস্ত্রের প্রয়োগ-বিধির অনেকটাই অনার্যদের কাছ থেকে আর্যদের ধার করা। এই বিধিটাকে আর্য ঋষিরা ঠিক বরদাস্ত করতে পারতেন না বলেই বেদকে তাঁরা ত্রয়ী সংজ্ঞায় অভিহিত করেছেন, অথর্ববেদকে আমল দিতে রাজী হননি। কিন্তু সংহিতোত্তর যুগে "ব্রাহ্মণ"-গ্রন্থসমূহে আমরা যে যজ্ঞপ্রক্রিয়ার বিধান দেখি তার মধ্যে অথর্ব-পুরোহিতরাও স্থান পেয়েছেন। অর্থাৎ, ত্রয়ী বেদের সাধনমার্গ ধীরে ধীরে অথর্ববেদের magicএর প্রভাবের সঙ্গে মিশতে শুরু

করেছে। এই সংমিশ্রিত ধর্মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন উপনিষদের ঋষিরা। তাঁরা দেখলেন যে বৈদিক ধর্ম ক্রমেই কামনা-বাসনা চরিতার্থ করবার পর্যায়ে নেমে আসছে। তাঁরা মাথা তুলে দাঁড়ালেন এই পন্থার বিরুদ্ধে। এই উপনিষদবাদের চরম পর্যায় হল বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম। উপনিষদের ঋষিরা বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে স্বীকার করেছেন কিন্তু যাগযজ্ঞকে মানতে চান নি। বৌদ্ধ এবং জৈনরা বেদকে একেবারেই মানতে চাইলেন না, তাই তাঁরা হয়ে দাঁড়ালেন অপাংক্তেয়। এ সম্বন্ধে M. Bloomfield লিখেছেন "On the other hand the Jainist and Buddhist literatures naturally cap their small esteem of the Veda in general with occasional express condemnation of the practices of the AV. Thus the Sutrakrtanga-Sutra 2.27 forbids the incantations of the Atharvan (atharvani); or the Atthakavagga 14.13 of the Suttanipata forbids the practice of the Athabbana Veda. To the condemnation of practices essentially Atharvanic is devoted the Maha Silam in the second chapter of the Tevijja-Sutta; similarly the Vinaya K(Cullavagga 5.32.2." (P. 27)

অনেকেই মনে করেন যে তন্ত্রের মধ্যে প্রয়োগবিধি এসেছে অথর্ববেদ থেকেই। তন্ত্র ভারতের বিভিন্ন সাধনধারার সমন্বয়ের চেষ্টা করেছে। বেদের কর্মকাণ্ড, উপনিষদের জ্ঞান এবং পুরাণের ভক্তি—এই তিনটি ধারা সমন্বিত হয়েছে তন্ত্রে। তাই তন্ত্রের মধ্যে আমরা অনেক বিভিন্ন স্তরের মালমশলা দেখতে পাই। লৌকিক প্রথাও এর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক তন্ত্রকে অতি সুপ্রাচীন বলে মনে করেন। এঁরা ধরে নেন যে বৈদিক যুগেই তন্ত্রের উৎপত্তি এবং বৈদিক ধারা ও তান্ত্রিক ধারা পাশাপাশি চলে এসেছে। এই মতের সুন্দর একটি সমালোচনা পাওয়া যায় অধ্যাপক নলিনীকান্ত ব্রহ্মের Philosophy of Hindu Sadhana পুস্তকে। আরও একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। সেটি হল এই যে আমরা তন্ত্রের যে প্রথম পুঁথি পাই (কুব্জিকামত তন্ত্র), কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত, তা গুপ্তযুগের শেষের দিকের রচনা, আর এই গুপ্তযুগেই প্রথম আমরা তাম্র শিলালিপি মারফৎ তান্ত্রিক প্রথার নিদর্শন পাই। তন্ত্রের মধ্যে যে বিভিন্ন সাধনার সমন্বয় হয়েছে, তা সম্ভব হয়েছিল কুষাণ যুগের আবহাওয়ায়। কুষাণ রাজাদের মুদ্রায় আমরা বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি দেখতে

পাই এবং বহির্ভারতীয় অনেক ধারা ভারতসাধনমার্গের বিভিন্ন স্তরে সন্নিবেশিত হয়েছিল। আর একটি কথা আমাদের মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। তান্ত্রিক মানেই সবসময়ে শাক্ত নয়, অর্থাৎ তন্ত্রবাদ মানেই শাক্ত মতবাদ নয়। তন্ত্র একটা সাধনার পদ্ধতি। যেমন, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌব, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের তন্ত্র আছে, তেমনি বৌদ্ধদের তন্ত্র আছে। সব সম্প্রদায়ই তন্ত্রমতে সাধনা করতে পারে। হিন্দুমতে সাধনাব আজ যে ধারা তা তন্ত্রের খাতেই বয়ে চলেছে। বৈষ্ণবরা যে নামগানের উপর এত জোর দেন সেটাও তান্ত্রিক মত, আর সব ইষ্টদেবদেবীর বীজ তান্ত্রিক মতে। বৈদিক সাধনার অঙ্গ আজ শুধু ব্রহ্মগায়ত্রী জপ, বাকি যা সবই তন্ত্র।

২

অথর্ববেদের সাক্ষ্য নিয়েই আমরা এখন আরম্ভ কবব প্রয়োগবিধির ইতিহাস। বিখ্যাত "তক্মন" সূক্তের কথাই ধরা যাক যা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির ছাত্র এবং গবেষকদের কাছে অতি পরিচিত। বর্ণনা থেকে মনে হয় যে তক্মন ম্যালেরিয়া জ্বরের অনুরূপ জ্বরবিশেষ। এর দ্বারা আক্রান্ত হলে মানুষের শরীরে পর্যায়ক্রমে কম্পন এবং উত্তাপ উপস্থিত হত। এ জ্বর সবিরাম। কখনও দু দিন তিন দিন অন্তর, কখনও বা তৃতীয় দিন বাদ দিয়ে এর আক্রমণ; বর্ষাকালে এর প্রাধান্য এবং যকৃতও এর দ্বারা আক্রান্ত হত। সেযুগের লোকেরা মনে করত যে 'অগ্নি'ই এর কারণ। আজ আমরা এ অসুখ সারাতে বিভিন্ন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই এবং ঔষধাদি গ্রহণ করি, তা সে কবিরাজীই হোক বা অন্য কোন পদ্ধতিরই হোক। কিন্তু অথর্ববেদে সারানর প্রক্রিয়া অন্যরূপ। এ রোগে আক্রান্ত হলে রোগীর জন্য তক্মনের কাছে প্রার্থনা করা হত—

'ওকো অস্য মূজবন্ত, ওকো অস্য মহাবৃষাঃ।
যাবজ্জাতস্তক্মংস্তাবানসি বহ্লিকেষু ন্যোচর॥
... ...
গন্ধারিভ্যঃ মূজবদ্ভ্যোঽঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ।
প্রৈষ্যন্ জনমিব সেবধিং তক্মানং পরিদদ্মসি॥' (৫, ২২. ১৪)

সমগ্র সূক্তটি এখানে উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই। তক্মনের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে এবং তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে মূজবৎ, মহাবৃষ, গন্ধার,

অঙ্গ এবং মগধ দেশে। তক্‌মনকে আরও অনুরোধ করা হয়েছে যে সে যেন এ রোগীটিকে ছেড়ে দেয় এবং মুজবৎ প্রভৃতি দেশের দাসী এবং শূদ্রদের যেন সে ভক্ষণ করে।

এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করার বিষয়। প্রথম, প্রয়োগ-বিধি; আমার অসুখ শুধু আরোগ্য হলে চলবে না, আমি আরোগ্যলাভ করব এবং অপরে এই রোগে আক্রান্ত হবে, তবেই আমার মনে সান্ত্বনা। এই মনোভাবটা সূক্তটির মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। ঋগ্‌বেদের শত্রুহননের প্রার্থনা আর এই জাতীয় প্রার্থনার মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শত্রুনিধন সব যুগে, সব দেশে এবং সব মানুষই কামনা করে থাকে। কিন্তু তক্‌মন সূক্তের ছবি অন্যরকম। গন্ধার, মুজবৎ প্রভৃতি দেশের দাসীরা আর শূদ্রেরা কোন অন্যায় করেনি, বোধহয় অন্যায় করবার ইচ্ছারও কোন প্রমাণ এদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অপকার কামনা করা হচ্ছে এদেরই। প্রয়োগবিধির এইটাই হল বৈশিষ্ট্য যে কেউ আমার শত্রুই হোক বা মিত্রই হোক বা সমভাবাপন্নই হোক আমার ইষ্ট-সাধনের জন্য তার অনিষ্টসাধন করতে আমি কুণ্ঠিত হব না। যেমন করে হোক আমার মঙ্গল আমি চাই; তার জন্য অপরকে যে দামই দিতে হোক। হিংসা বা জিঘাংসা যদি পাপ হয়, তাহলে এ প্রয়োগবিধি যে কত বড় পাপ তার বোধহয় তুলনা নেই। এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটি নিম্নস্তরের সাধনার অঙ্গ। তন্ত্রের মধ্যে আমরা যেমন অতি উচ্চস্তরের সাধনা পাই, তেমনি এইসব নিম্নস্তরের সাধনারও নিদর্শন দেখা যায়। এটা বোধহয় হিন্দুধর্মেরই বৈশিষ্ট্য। এর একধাপে শঙ্করের বেদান্ত আর এক ধাপে অতি নিম্নস্তরের কুসংস্কার।

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা এবং ঐতিহাসিকরা এই তক্‌মন সূক্তে আমরা যে মনো-বৃত্তির পরিচয় পাই তার অন্য একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে ভারতবর্ষে দুবার দুটি বিভিন্ন দলে এবং বিভিন্ন সময়ে আর্যরা এসেছিলেন। এর একদল বাস করছেন উত্তর প্রদেশে এবং পূর্ব পাঞ্জাবের কিয়দংশে এবং আর একদল এঁদের ঘিরে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আরম্ভ করে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, বিহার এবং বাংলা দেশে বসতি স্থাপন করেছেন। এই দুই দল আর্যদের মধ্যে বরাবরই একটা রেষারেষির ভাব দেখা যায়। 'তক্‌মন' সূক্তের ঋষি বাস করতেন এই "inner band of the Aryan"

দেশে। তাই তিনি তক্‌মনকে "outer band" দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কারণটা যাই হোক, এই তথাকথিত ঋষি একটু হীন মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিয়েছেন। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে, এই ঋষিবর কেন তক্‌মনকে ম্লেচ্ছদেশে পাঠালেন না? ঋগ্‌বেদের যুগ থেকে আরম্ভ করে আর্যেতর ম্লেচ্ছরা চিরদিনই আর্যজগতে উৎপাত করেছে। তক্‌মনের কাছে তাদের ভক্ষণের প্রার্থনা করলে আরও সমীচীন হত না কি? কেন এরকম প্রার্থনা করা হয়নি তা নির্ণয় করা আজ আমাদের সাধ্য নয়। তবে এটা অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে এইরকম প্রয়োগবিধি অথর্ববেদের ঋষিরা আর্যেতর জাতির কাছে শিখেছিলেন, তাই বোধহয় তাঁরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। সুতরাং জ্ঞাতিভাইদেরই তক্‌মনের ভক্ষ্য করা শ্রেয়।

এখানে আর একটি সূক্তের কিছু অংশ আমরা লক্ষ্য করতে পারি। এক-জনকে সাপে কামড়েছে এবং সে বিষে জরজর। তার আরোগ্যের জন্য মন্ত্র পাঠ করা হচ্ছে :

"হে বিষ তুমি চলে যাও। তুমি আমাদের শত্রুসম। তুমি আমাদের নয় সকলের শত্রুসম। যে সাপের কাছ থেকে তুমি এসেছ, তার কাছে ফিরে গিয়ে তাকে হত্যা কর।"

এই প্রার্থনার মধ্যে যদিও একটা প্রতিহিংসার মনোভাব বর্তমান, তবুও তক্‌মন প্রার্থনার চেয়ে এ মনোভাব অনেকটা উচ্চস্তরের। শত্রুকে নিধনের আকাঙ্ক্ষা সব জাতির মধ্যে সব যুগেই বর্তমান। তাই এ প্রয়োগবিধি নৈতিক মানের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সমর্থন করা না গেলেও এটা সাধারণ মনোবৃত্তির পরিচায়ক। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে :

শত্রু মেরে হাসি আর কার্য সেরে বসি।

এ প্রবাদটার মূলেও রয়েছে একটা সাধারণ মনোভাব। ঠিক এইরকম একটা মনোবৃত্তি আমরা দেখতে পাই যেখানে সপত্নীবিনাশের জন্য মন্ত্রের ব্যবহার করা হচ্ছে। যদিও আজ মন্ত্র নেই তবু প্রচলিত প্রবাদ এই মনো-বৃত্তির সাক্ষ্য দেয় : "বঁটি বঁটি বঁটি, সতীনকে ধরে কুটি।" অবশ্য অথর্ববেদের মধ্যে যে সব সময়েই এরকম একটা জঘন্য মনোবৃত্তি পাওয়া যায় তা নয়, অনেক জায়গায় মানুষের মঙ্গলের জন্যও এইরকম সব মন্ত্রের প্রয়োগ করা হয়েছে। এই বেদ পাঠ করলে সে যুগের ভারতবাসীর মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে যে কি রকম জ্ঞান ছিল তা দেখে চমৎকৃত হতে হয়, যদিও

এ জ্ঞানটা প্রকাশ করা হয়েছে প্রয়োগবিধি মারফৎ। যেমন প্রার্থনা করা হচ্ছে: "গাভীরা তাদের বিশ্রামস্থানে বিশ্রাম নিচ্ছে; পাখীরা তাদের বাসায় স্থিতিশীল হয়েছে; পর্বতসমূহ স্বীয় জায়গায় দণ্ডায়মান; আমি (রোগীর) মূত্রাশয়কে তার প্রকৃতস্থানে স্থাপন করছি।" ৭, ২৪, ১॥ আর একটি মন্ত্র: "চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, মস্তিষ্ক, গণ্ড, পৃষ্ঠ এবং বাহু থেকে আমি সব রোগকে বিতাড়িত করছি।" ২, ৩৩, ১॥

এই সব মন্ত্র আলোচনা করলে আমরা দুটি জিনিস দেখতে পাই; প্রথম হচ্ছে, মন্ত্রে বিশ্বাস এবং দ্বিতীয় রোগ, দারিদ্র্য, দুঃখ সবই আমাদের মত সচেতন। মানুষ যেমন অনুরোধে বা তাড়নায় হুকুম পালন করে সেইরকম এরাও মন্ত্রের তাডনায় আমাদের হুকুম পালন করবে। এরা ত সচেতন বটে, তাই এদের নিয়ে মাথা ঘামাবার অত প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করা, তাহলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। এই বিশ্বাস থেকেই একদিকে উদ্ভব হল পুরোহিতদের এবং অপরদিকে ওঝার। আমি যত ভক্তিভরেই মন্ত্র উচ্চারণ করি না কেন, তার কোন ফল হবে না। কিন্তু পুরোহিত মহাশয় এসে একটু বিড়বিড় করলেই সব সিদ্ধ হয়ে যাবে। এটা শুধু হিন্দুধর্মেই নয়, সব ধর্মেই পুরোহিতের প্রবল প্রতাপ। প্রধানত এঁরা সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করেন এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ। পাশাপাশি একদল অব্রাহ্মণ পুরোহিতেরও উদ্ভব আমরা দেখতে পাই এবং প্রয়োগবিধির কাজে এঁদেরই দক্ষতর বলে ধরে নেওয়া হয়। ওঝারা আমাদের সমাজে সাধারণত নিম্নশ্রেণীর লোক। এঁরা যে সমস্ত মন্ত্র পাঠ করেন সেগুলি বেশির ভাগই স্থানীয় ভাষায় রচিত। এঁরাও মানুষের মঙ্গলের জন্য একদিকে কাজ করেন এবং আর একদিকে করেন মারণ বশীকরণ উচাটন প্রভৃতি। সাধারণ ঐতিহাসিকদের মতে বৈদিক ধর্ম ক্রমে ক্রমে magicএর পর্যায়ে এসে নামে এবং তখনই উদ্ভব হয় এই সব বিশ্বাসের। আর এই বিশ্বাসকেই কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে পুরোহিতদের পসার বাড়তে থাকে। Frazer প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ্‌রা কিন্তু এ মত সমর্থন করেন না। তাঁরা বলেন প্রথমে magicএর উৎপত্তি এবং এই magicই পরে ধর্মে রূপান্তরিত হয়। Frazerএর মতকে মেনে নিলে আমরা ধর্মবিবর্তনের ইতিহাসে ভারতবর্ষে তিনটি স্তর দেখিতে পাই: প্রথম, প্রাগ্‌বৈদিক স্তর; এই স্তরের প্রথম উন্মেষ সম্ভবত আর্যজাতির আদিম বাসভূমিতে। কারণ, ঋগ্‌বেদের মধ্যে

আমরা ধর্মের একটা উন্নত স্তর দেখি। যদি ঋগ্‌বেদ এদেশের আর্যদের প্রথম কীর্তি হয় তাহলে এটা ধরে নিতেই হবে যে এ ধর্মের magicএর স্তর প্রাক্-ঋগ্‌বৈদিক যুগে, আর সেটা সম্ভবত আর্যদের আদিম বাসভূমিতেই পরিণতি লাভ করে থাকবে। দ্বিতীয়, ত্রয়ী অর্থাৎ ঋক্, যজুস্ এবং সামবেদের স্তর, যখন আমরা দেখি ধর্মের স্থান আগে, magicএর স্থান তার আরও পরে। তৃতীয়, 'ব্রাহ্মণ', গৃহ্যসূত্র এবং শ্রৌতসূত্রের যুগ, যখন আমরা আবার magic-এর প্রাদুর্ভাব দেখি। এখন সমস্যা দাঁড়ায় অথর্ববেদকে নিয়ে, একে আমরা কোন স্তরে ফেলব? কারণ অথর্ববেদ নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ এবং সূত্র গ্রন্থাদির পূর্ববর্তী। এইজন্যই কল্পনা করা হয়েছে যে এর অনেক মালমশলা এসেছে এমন স্তর থেকে যেখানে magic মুখ্য, ধর্ম গৌণ।

৩

আমরা এতক্ষণ অথর্ববেদ নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা করছিলুম, কারণ অথর্ববেদই হচ্ছে ভারতের প্রয়োগবিধির উৎসস্বরূপ। অথর্ববেদের মধ্যে মন্ত্রের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী যুগে আমরা দেখতে পাই মন্ত্রের সঙ্গে বা মন্ত্রপূত করে এই সব উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বস্তু ব্যবহার করা হচ্ছে। সরিষা দিয়ে ভূত তাড়ান বা সিঁদুর কপালে লাগিয়ে বশীকরণ করা ইত্যাদি প্রথার কথা আজও গল্পের মত আমরা শুনতে পাই। এ সবগুলিরই উৎপত্তি বেদোত্তর যুগে। দ্রব্য মারফৎ মন্ত্রের প্রক্রিয়া মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মন্ত্রকে একধাপ নীচে নামিয়ে দেয়। মন্ত্রের আর নিজের কাজ করবার ক্ষমতা নেই; তাকে শক্তি পেতে হলে যেন আর একটা আশ্রয়ের দরকার। এখানে আরও একটা চিন্তাধারা গোপনে কাজ করছে। সেটা হচ্ছে প্রত্যেক দ্রব্যের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত শক্তিতে বিশ্বাস। এটা অনেকটা ইউরোপের Neo-Platonist চিন্তাধারার মত।

বেদোত্তর যুগে যখন এইসব প্রক্রিয়া প্রয়োগ হিন্দু সমাজে চলতে শুরু করে তখন বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ঘটে। আদি পালিগ্রন্থে এই সমস্ত অলৌকিক কাজকর্মকে হীন চক্ষে দেখা হয়েছে এবং সন্ন্যাসীদের এপথ থেকে বিরত থাকবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতেও শ্রীভগবান বলেছেন যে সাধনার প্রথম স্তরে মানুষের বিভূতি লাভ হয়। সে বিভূতির সাহায্যে অলৌকিক কাজ করতে পারে কিন্তু তা নিয়ে ভুলে থাকলে সাধক

পথভ্রষ্ট হবে। অবশ্য এটা স্বীকার করতেই হবে যে বিভূতিলাভ আর প্রয়োগবিধি ঠিক এক জিনিস নয়। কিন্তু ভ্রষ্ট সাধক এই বিভূতিকে প্রয়োগ-বিধির পর্যায়ে সহজেই নামিয়ে আনতে পারেন। এই শঙ্কা করেই সম্ভবত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বুদ্ধদেব সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রেও সাধকের অলৌকিক ক্ষমতালাভের অনেক উপায়ের বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এগুলিও প্রয়োগবিধি হতে ভিন্ন। যাই হোক, বৌদ্ধধর্ম নিজেকে বেশীদিন এই পথ থেকে দূরে রাখতে পারেনি। এদের মধ্যেও ধীরে ধীরে এই সব সংস্কার প্রবেশ করে, বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানের পরবর্তী যুগে যখন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়। বৌদ্ধ লেখক তারানাথ গন্ধর্ববিদ্যার কথা উল্লেখ করেছেন। এই গন্ধর্ববিদ্যা মারফৎ অনেক অলৌকিক কার্য সাধন করা যেত। অবশ্য প্রয়োগ উদ্দেশ্যে এ বিদ্যার ব্যবহার হত কিনা তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এইরকম বিদ্যার উল্লেখ আমরা বিভিন্ন তান্ত্রিক বৌদ্ধগ্রন্থেও পাই এবং সেগুলি যে প্রয়োগ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত তার কোনও সন্দেহ নেই। এইখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভাল যে প্রয়োগবিধিকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—মানুষের মঙ্গলের জন্য, অথবা ব্যক্তিবিশেষের অপকারের জন্য। উপকারের জন্য প্রয়োগবিধি সিংহল প্রভৃতি স্থানে মহাযান বৌদ্ধদের মধ্যে আজও দেখা যায় এবং প্রাচীন পালিগ্রন্থেও এর নিদর্শন পাওয়া যায়। অপকারের জন্য প্রয়োগবিধি সম্ভবত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মেই প্রকাশ পায়। তিব্বতের যে বৌদ্ধধর্ম সেটা মহাযান এবং তান্ত্রিক। এদের মধ্যে প্রয়োগবিধির প্রচলন খুব বেশী। এদের বিখ্যাত মন্ত্র হল "ওম্ মণিপদ্মে হুম্"। বৌদ্ধরা মনে করে যে এই মন্ত্রের উচ্চারণে সব বাধাবিপত্তি চলে যায় এবং মানবজীবনের সব কিছু কল্যাণ সাধিত হয়। এটাকে অবশ্য প্রয়োগ পর্যায়ে ফেলা উচিত হবে না, বিশেষ করে যাঁরা ভক্তিভরে এ মন্ত্র জপ করেন নির্বাণলাভের কামনায়, তাঁদের ক্ষেত্রে। কিন্তু এ মন্ত্রের যখন অপব্যবহার হয়, যখন এটাকে চাওয়া-পাওয়ার পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয় তখন অবশ্যই এর ভাবার্থ অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়। যাই হোক, এ মন্ত্রের কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা তিব্বতবাসীদের জীবনের অন্য দু'একটা প্রথা লক্ষ্য করতে পারি। লাহুল উপত্যকায় বীজবপনের আগে মেয়েরা ক্ষেত্রের উপর বিভিন্ন ধ্বনি করতে করতে বৌদ্ধ-গ্রন্থাদি নিয়ে ঘরে বেড়ায়। তাদের বিশ্বাস যে এর দ্বারা অপদেবতারা

পালিয়ে যাবে এবং শস্যের আর কোনও উৎপাত হবে না। তারপর যখন শস্যের অঙ্কুর বেরোয় তখন দেবদারু গাছের একটা ছোট ডালের টুকরো এনে তারা মাঠের মাঝখানে জ্বালিয়ে দেয়। তারা মনে করে যে এর গন্ধে অপদেবতারা পালিয়ে যাবে এবং শস্যের আর কোনও ক্ষতি হবে না। এদের নিজেদের ভাষায় লেখা যে সমস্ত তান্ত্রিক গ্রন্থ আছে তার মধ্যেও আমরা এই সব প্রক্রিয়ার বহু নিদর্শন পাই। এরা ঢাকের বাদ্যধ্বনি করে ভূত তাড়ানর জন্য। প্রত্যেক তিব্বতী পুরোহিতের কাছে একটি করে দোর্জি থাকে; এটি বজ্র-কথার নামান্তর। এরা বিশ্বাস করে যে প্রথম দোর্জি ইন্দ্রের কাছ থেকে লাসার নিকট এসে পড়েছিল। এখন এরা এদের কাছে ব্রঞ্জ বা অন্য কোন ধাতুনির্মিত দোর্জি রাখে এবং স্মরণ করে বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণির। এই দোর্জির সাহায্যে এদের ভালমন্দ অনেক প্রয়োগবিধির অনুষ্ঠান।

৪

আধুনিক যুগে আমাদের সমাজে অনেক রকম প্রয়োগবিধি চলে আসছে। সাধারণত অশিক্ষিতদের মধ্যে এর বহুল প্রচলন থাকলেও শিক্ষিতদের মধ্যেও এর প্রচলন কিছু কম নয়। ধরুন পঞ্জিকার কথা। পঞ্জিকা যাঁরা মেনে চলেন তাঁরা হয় নিজেরা পঞ্জিকা দেখেন অথবা অশিক্ষিত হলে পণ্ডিতের কাছ থেকে পঞ্জিকার মতামত জেনে নেন। আপনার ঘরেও পঞ্জিকা নিশ্চয়ই আছে। খুলে দেখুন, ভাদ্রমাসে শুক্লা এবং কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে নষ্টচন্দ্র। ঐদিন চন্দ্র দর্শন করলে মিথ্যা অপবাদ হয়। কিন্তু এই অপবাদের স্খালন করতে হলে নিম্নলিখিত মন্ত্রে জলপান কর্তব্য:

সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ
সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যামন্তকঃ ॥

তর্কের খাতিরে না হয় মেনেই নিলুম যে এরকম একটা ঘটনা হয়ত একদিন ঘটেছিল। প্রসেন সিংহের দ্বারা নিহত হল এবং জাম্ববান সিংহকে বধ করল। আর সুকুমারকে তখন স্যমন্তক মণি দিয়ে ভোলান হল। এ গল্প শুনে কুমারের হয়ত কান্না থেমে যেতে পারে, কিন্তু এটি উচ্চারণ করলে আমাদের কলঙ্ক কি করে দূর হবে বোঝা শক্ত। কিছুদিন আগেও বর্গীর ভয় দেখিয়ে আমাদের দিদিমা-ঠাকুমারা ছোট ছেলেদের কান্না থামাতেন বা ঘুম

পাড়াতেন। কিন্তু তাই বলে কি নিম্নোক্ত ছড়া কেটে জলপান করলে আমাদের কলঙ্ক দূরে চলে যাবে :

ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গী এল দেশে
খোকন তুমি কাঁদলে পরে খাজনা দেব কিসে ?

খোকনের কান্না থামল যেমন একদিন সুকুমারের কান্না থেমেছিল। কিন্তু প্রথমটি স্মৃতির বিধান তাই সর্বথা গ্রহণীয় এবং পালনীয়। আর দ্বিতীয়টি লৌকিক গাথা, কোনও দামই নেই। অবশ্য কোনও কোনও মতে এর দ্বিতীয় পংক্তিতে খোকনের কান্না থামার উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় পংক্তিটি হল, 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে'। ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নাকি নেপো অর্থাৎ Napoleonএর নাম করে শিশুকে ভয় দেখিয়ে কান্না থামান হত, ঘুম পাড়ান হত। কিন্তু নেপোর নাম করে জলপান করায় কলঙ্ক দূরীভূত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে কোথায়ও পাওয়া যায় না। অন্তত ইতিহাসের ছাত্র হয়ে আমার তা জানা নেই।

সন্তান প্রসবকে কেন্দ্র করে বহু বিপদের আশঙ্কা। মেয়েদের এটা জীবন-মরণের যুদ্ধ। এর জন্য যে প্রয়োগবিধির প্রচলন তা অতি সহজ। আপনার ডাক্তার নার্সের প্রয়োজন নেই, কোন চিন্তা নেই, শুধু অশ্বত্থগাছের পাতায় মন্ত্র লিখে সন্তান-সম্ভবার চুলে বেঁধে দিন। ছুরি সাঁড়াশী কিছুর দরকার হবে না। গর্ভে যেভাবেই সন্তান থাক সে সুখে ভূমিষ্ঠ হবে। মন্ত্রটি এইরূপ :

অস্তি গোদাবরীতীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী।
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ বিশল্যা গর্ভিণী ভবেৎ॥

পুরোহিত মহাশয়রা উপরি-উক্ত দুটি মন্ত্রে কলঙ্ক অপসারণের জন্য এবং সুখ-প্রসবের জন্য বিধান দিলেও দ্বিতীয় শ্লোকটি উদ্ভট। প্রথমটি মেলে স্যমন্তক উপাখ্যানে। কিন্তু যখন আমরা এই ধরনের জিনিস তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যেও দেখতে পাই তখন একে ধর্মীয় কুসংস্কার ছাড়া অন্য কিছু বলার উপায় নেই; 'বৃহৎ তন্ত্রসার' থেকে কয়েকটি বিষয় নিয়ে উদ্ধৃত করছি। বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন শ্রীমৎ প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী ভট্টাচার্য। মূল সংস্কৃত না দিয়ে অনুবাদটাই এখানে দেওয়া হল। প্রণয়িনী আমার প্রতি বিরূপা। এখনকার যুবকরা স্নো পাউডার ইত্যাদি দিয়ে প্রণয়িনীর মন আকর্ষণের চেষ্টা করেন। হয়ত কখনও প্রণয়িনীর পিতার তাড়া খেয়ে প্রণয় ভেঙে যায়, না হয় আত্মহত্যা। তন্ত্রসারে

কিন্তু প্রয়োগের দ্বারা মন হরণ করবার বিষয় লিখিত আছে। বর্ণনাটি এইরূপ :

"অনন্তর আকর্ষণবিধি কথিত হইতেছে—মহাদেব বলিয়াছেন যে সকল আকর্ষণমন্ত্র ও তাহার বিধি ত্রিপুরাতন্ত্রে ও ভূতডামরে দৃষ্ট হইয়াছে, সেই সকল আকর্ষণবিধি সংক্ষেপে বলিতেছি।…(এইখানে একটি বহুবাক্যসমন্বিত মন্ত্রের উল্লেখ আছে)…। এই মন্ত্র দশ সহস্র জপ করিবে। রক্তচন্দন ও কুঙ্কুম দ্বারা ষট্‌কোণ যন্ত্র লিখিয়া তাহাতে উক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে। উক্ত মন্ত্রে করাঙ্গন্যাস যথা,—……। এই মন্ত্রপ্রভাবে রম্ভা ও উর্বশীকেও আকর্ষণ করিতে পারে, মানুষীর আকর্ষণে আর আশ্চর্য কি ? ভূর্জপত্রে কুঙ্কুম, অলক্তক, কস্তুরী, অগুরু ও গোরোচনা মিশ্রিত অনামিকার রক্ত দ্বারা…মন্ত্র লিখিয়া সেই ভূর্জপত্রের উপরই…এই মন্ত্র এক সহস্র জপ করিবে। পরে ঐ ভূর্জপত্র গুলিকা করিয়া অভিলষিত ব্যক্তির পদের কর্দম দ্বারা বেষ্টন করিবে। পরে ঐ কর্দম-বেষ্টিত গুলিকা রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এবং ত্রিকটু অর্থাৎ মরিচ, পিপ্পলী ও শুণ্ঠির দ্বারা ঐ অভিলষিত কামিনীর অনুরূপ প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া তাহার উদর মধ্যে ঐ গুলিকা নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর সেই প্রতিমা কোন পাত্রে স্থাপন করিয়া সেই কামিনী যেদিকে আছে, তদভিমুখে উপবেশন করিয়া রাত্রিকালে কোন নির্জনস্থানে পূর্বলিখিত…মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে সেই কামিনী…সাধকের নিকট আগমন করে।"

সবচেয়ে আশ্চর্য যে এ কার্য যিনি করছেন তিনি একজন সাধক। অবশ্য যে কোন প্রকারের সাধনা যে করে তাকেই যদি সাধক বলে গণ্য করা যায় তাহলে "তাদৃশাভিমুখো ভূত্বা নির্জনে নিশিসাধকঃ" ছত্রে সাধক শব্দের ব্যবহারে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু সাধক বললে আমাদের মনের মধ্যে অন্য ছবি জেগে ওঠে।

ঐ তন্ত্রসারের মধ্যেই আমরা বিদ্বেষণ প্রক্রিয়ারও বিবরণ পাই। বিবরণটি এইরূপ :

"যে দুই ব্যক্তি পরস্পর রোষপরবশ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদিগের নখাঘাতে উড্ডীন ধূলি আনিয়া সেই ধূলিদ্বারা বন্ধুদ্বয়কে তাড়ন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষভাব উপস্থিত হয়। মহিষ ও ঘোটকের বিষ্ঠার সহিত গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া সেই মিশ্রিত দ্রব্যদ্বারা যে দুই ব্যক্তির নাম লিখিবে, সেই দুইজনের পরস্পর বৈরভাব উপস্থিত হইয়া

থাকে। মহিষ ও অশ্বরক্তদ্বারা শ্মশানবস্ত্রে যাহাদিগের নাম লিখন করা যায়, সেই দুই ব্যক্তির পরস্পর বিদ্বেষ হইয়া থাকে। ষট্‌কোণ চক্রমধ্যে শত্রুদ্বয়ের নাম লিখিয়া তদুপরি··(এখানে একটি বিরাট মন্ত্র দেওয়া আছে)···এই মন্ত্র লিখলে সেই শত্রুদ্বয়ের পরস্পর বিদ্বেষ হইয়া থাকে।"

আরও অন্য একটি বিদ্বেষণ প্রক্রিয়ার কথা এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এখানেও যিনি এই কাজ করছেন তাঁকে সুধী বলে বর্ণনা করা হয়েছে (অমুনা মন্ত্ররাজেন হোমষেৎ প্রযত সুধীঃ)। এই বিদ্বেষণকারী কোন সমাজের সুধী তা নির্ণয় করা শক্ত। এ সুধীকে বোধহয় তন্ত্ররাজ্যের diplomat বললেই ভাল হয়।

শত্রুদ্বয়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করলেই প্রতিহিংসার সম্পূর্ণ শান্তি হয় না। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে হলে অন্তত উচাটনের প্রয়োজন। শত্রু অস্থির হয়ে ছটফট করবে, তাতে অনেকেই আনন্দ পান। উচাটনের প্রণালী নিম্নলিখিতভাবে তন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে :

"নিম্বপত্রে কাকপক্ষে লেখনী যোগে মহিষ এবং অশ্বের বিষ্ঠাদ্বারা··· (এখানে একটি মন্ত্র দেওয়া আছে)···ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্বোক্ত দ্রব্যের দ্বারা শত্রুর নাম লিখিবে। অনন্তর উক্তমন্ত্রে পূজা করিয়া নিম্ববৃক্ষস্থিত কাকপক্ষীর কুলায় কাষ্ঠ দিয়া হোম করিবে। হোমের বিশেষ এই,—শ্মশানের অগ্নি আনিয়া ধুস্তূরকাষ্ঠে সেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া নরতৈল (নররক্ত) অথবা মরিচ প্রভৃতি কটুদ্রব্যের সহিত কাকের বাসায় কাষ্ঠদ্বারা হোম করিবে। অনন্তর···(এখানে এক দেবীর নাম উল্লেখ আছে)···পূজা করিয়া পূর্বোক্ত মন্ত্রে সর্ষপতৈলের সহিত নিম্বপত্রদ্বারা হোম করিতে হইবে। পরে সাধক ধ্যানযুক্ত চিত্তে যাহার নিকেতনে সেই যজ্ঞীয় ভস্ম নিক্ষেপ করে, সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হইয়া থাকে।"

এতক্ষণ আমরা প্রয়োগবিধির খারাপ দিকটাই দেখেছি। এর ভাল দিকও একটা আছে। প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে যে বৃশ্চিকাদি সর্বপ্রকার বিষ, জ্বর, অজীর্ণ, বিসর্প, দন্তাদিশূল, নেত্রাদিরোগ ও সর্বপ্রকার বেদনা বিনষ্ট করার 'বিষহরাগ্নি' মন্ত্রও আছে। আর একটি বৃশ্চিকাদি বিষহর মন্ত্র সম্বন্ধে লিখিত আছে যে এই মন্ত্র শুধু যে বিষ হরণ করবে তাই নয় "এই মন্ত্র সমুদ্রগামিনী নদীতীর অথবা উষরভূমিতে দক্ষিণমুখে উপবেশন করিয়া উর্ধ্ববাহু হইয়া

আর্দ্রবস্ত্র পরিধানপূর্বক জপ করিবে। যাবৎ ঐ পরিধান বস্ত্র শুষ্ক হয় তাবৎ শত্রুর প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়।”

৫

এখন সাধারণ, বিশেষ করে গ্রাম্য লোকদের মধ্যে যে সব প্রয়োগবিধি প্রচলিত আছে তা নিয়ে একটু আলোচনা করব। এখানেও মন্ত্রশক্তি এবং দ্রব্যশক্তিকে বা দ্রব্যগুণকে একীভূত করা হয়েছে। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে বেদোত্তর যুগ থেকে এই রকম প্রথা চলে আসছে। এই গ্রাম্য বিধিগুলির উৎস হয়ত বেদোত্তর যুগের প্রক্রিয়াগুলি। পার্থক্য যে মন্ত্রগুলি গ্রাম্য ভাষায়। এই রকম অনেকগুলি মন্ত্রের সঙ্গে ‘হাড়ি মা’র নাম সন্নিবেশিত। হয়ত এই সব মন্ত্রবিদ্‌দের ‘মা’ হাড়ি শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। হাড়িকে আমরা সাধারণত নীচজাতি বলে গণ্য করে থাকি। সম্ভবত বাগ্দীদের মত হাড়ি বাংলার একটি প্রাচীন উপজাতি এবং সেই উপজাতির কোন এক মহিলা এই মন্ত্রগুলি গ্রথিত করে থাকবেন। আজও এই সব প্রক্রিয়াকারীরা তাই তাঁকে স্মরণ করে প্রয়োগবিধি আরম্ভ করে। শ্রদ্ধেয় শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় শব্দকোষে দেখিয়েছেন যে ময়নামতীর গান ও গোপীচাঁদের গানের মধ্যে হাড়িসিদ্ধাদের উল্লেখ আছে। তিনি ভারতচন্দ্রের লেখা থেকে একটি পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন :

‘সুরঙ্গের মাটি কাটি উড়ে যাবে বায়।
হাড়ি ঝি—চণ্ডীর বরে কামাখ্যা আজ্ঞায়॥’

তিনি এর উপর যে টিপ্পনী লিখেছেন সেটি হল এইরূপ :

“হাড়ি-ঝি রূপে চণ্ডীর অবতার জানি না। বোধ হয়, কোন সিদ্ধা হাড়ি-ঝি চণ্ডীর অবতার রূপে পূজিতা হইয়াছিলেন। ঝাড়ফুঁক মন্ত্রে ‘হাড়িঝি-চণ্ডীর আজ্ঞা ছাড় ছাড় ছাড়’ এইরূপ ছাড়ানর মন্ত্র শুনিয়াছি।”

হয়ত এই হাড়িসিদ্ধা—যাঁকে চণ্ডীরূপে কল্পনা করা হয়েছে—কামাখ্যা থেকে কিছু মন্ত্রাদি শিখে এসেছিলেন বা সেই মহাপীঠে তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এখনও সাধারণ একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে কামাখ্যার লোকেরা নানারকমের ঝাড়ফুঁক বা মন্ত্রাদি জানে। কামাখ্যাতন্ত্র নামে একটি অর্বাচীন গ্রন্থ কলিকাতার হাটখোলাস্থিত কোন কোন দোকানে পাওয়া যায় এবং তাতে এইরকম অনেক মন্ত্র জড় করা হয়েছে। আর একটি এইরকম

গ্রন্থ বৃহৎভুবনমোহিনীতন্ত্র। এ বইটিও পাওয়া যায় ঐ একই জায়গায়। এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয় যে এই সব প্রয়োগবিধির সঙ্গে আদ্যাশক্তির বিভিন্ন নাম বা পীঠস্থানের নাম জড়িত। এ থেকে অনুমান করা বোধহয় অন্যায় হবে না যে এইসব মন্ত্রগুলি শক্তিসাধকদের মধ্যেই প্রথমে প্রচলিত ছিল এবং সেখান থেকে এই ধারা দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে ইতিহাসের দু' একটা কথা টেনে আনলে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বরঞ্চ তা থেকে আমরা একটা নূতন উৎসের সন্ধান পাব। চলতি মন্ত্রগুলি পীঠস্থানের সঙ্গে জড়িত, সুতরাং পীঠস্থানের কথা নিয়েই এখানে আলোচনা শুরু করব। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী তাঁর 'Studies in the Tantras' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে পীঠস্থান ছিল প্রথমে চারটি। পরে এটি বাড়তে বাড়তে একান্নটি পীঠে পরিণত হয়। প্রাণ-তোষিণী তন্ত্রের মধ্যে এই একান্নটি পীঠস্থানের কথাই বলা হয়েছে। প্রথম যে চারিটি পীঠস্থানের উল্লেখ আমরা পাই তা হল উড্ডিয়ান বা ওড্ডিয়ান, জালন্ধর, কামরূপ ও পুর্ণ-গিরি। ওড্ডিয়ান Swat নদীর উপত্যকায় এবং জালন্ধর পাঞ্জাবে। কামাখ্যা ও পুর্ণগিরি ভারতের পূর্বদিকে, যদিও পুর্ণগিরির অবস্থান সম্পর্কে এখনও সঠিক কিছু বলা শক্ত, কারণ এ বিষয় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যাই হোক, জালন্ধর থেকে একটি পথ Swat উপত্যকা হয়ে প্রাচীন যুগে মধ্য এশিয়াতে পৌছাত। কামাখ্যা থেকে আর একটি পথ গিয়েছিল মহাচীনে বা তিব্বতে। এই দুই পথ বেয়ে এশিয়ার অনেক চিন্তাধারা এবং সামাজিক তথা ধর্মীয় প্রথা আমাদের ধর্মে, বিশেষ করে শাক্তধর্মে প্রবেশ করেছে। দুটি দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে। নীলতন্ত্রে বলা হয়েছে যে আদ্যাশক্তি মেরুর পশ্চিম পার্শ্বে Col হ্রদে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। মেরু পামিরের প্রাচীন নাম। এর পশ্চিম পার্শ্বে Syr-Daria এবং Amu-Daria উপত্যকা। প্রাচীনকালে এটি ছিল শক জাতির বাসস্থান। আমরা আমাদের শাস্ত্রে আদ্যাশক্তির সঙ্গে শাকিনী এবং ডাকিনীদের উল্লেখ পাই। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে শাকিনীরা শক নারী এবং ডাকিনীরা ডগ নারী। যে Dagদের আমরা মধ্য এশিয়ার Dagistanএ দেখতে পাই, এরা এই জাতিরই নারীবিশেষ। বশীকরণ উচাটন প্রভৃতি কার্যে অনেক সময় এই শাকিনী ডাকিনীদের মন্ত্রমারফৎ আহ্বান করা হয়। এ থেকে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে প্রয়োগবিধির

একটা অংশ হয়ত মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসে ভারতীয় রূপ ধারণ করেছিল যদিও এর আদি উৎস অথর্ববেদ। আমাদের আচারের মধ্যে যে মধ্য এশিয়ার অনেক জিনিস এসেছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। যেমন, মহাভারতে আমরা পাঠ করি যে দুঃশাসনকে বধ করার পর দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম তার রক্ত পান করতে আরম্ভ করেন। মধ্য এশিয়াতে আমরা জানি এই ধরনের প্রথা প্রচলিত ছিল। শত্রুকে বধ করবার পর বিজয়ী জিহ্বা দিয়ে শত্রুরক্ত চেটে নিত। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। কুরু-পাণ্ডবদের সময় যত প্রাচীনই হোক আমরা যে মহাভারতটি পাই তার রচনা-কাল কিন্তু অত প্রাচীন নয়। মহাভারতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত E. W. Hopkins মনে করেন যে মহাভারতটি লেখা হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ অব্দ থেকে তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। অর্থাৎ প্রায় সাত শ বৎসর ধরে মহাভারতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মালমশলা সন্নিবেশিত হয়েছে। মহাভারত পাঠ করলে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে মৌর্যোত্তর যুগের বহু মালমশলা এর মধ্যে সন্নিবেশিত। মধ্য এশিয়ার যে সব প্রথা ভারতে প্রবেশ করেছে তারই একটি নিদর্শন হল দ্বিতীয় পাণ্ডব কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান। এইবার আমাদের নিজেদের বিষয়ে আসি। জালন্ধর প্রাচীন ভারত—মধ্য এশিয়ার পথের উপর অবস্থিত, আর এই জালন্ধর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার জন্য বিখ্যাত। আজও বিজ্ঞাপনে দেখতে পাবেন জালন্ধর শহরে কত ইন্দ্রজালের নমুনা। এসবগুলি প্রয়োগবিধিরই অধস্তন সংস্করণ।

ভারতের পূর্বদিকে মহাপীঠ কামাখ্যা ভারত-মহাচীন পথের উপরে অবস্থিত এবং পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই কামাখ্যা বিভিন্ন মন্ত্র-প্রক্রিয়ার জন্য বিখ্যাত। এই প্রসঙ্গে আমরা তন্ত্রের মধ্যে আর একটি ঘটনারও উল্লেখ পাই। বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মার নিকট দীক্ষা নিয়ে তারার সাধনা আরম্ভ করেন। কিন্তু বহু বৎসর সাধনা করেও দেবীর দর্শন না পেয়ে তিনি তখন দেবীকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হন। এই সময়ে দেবী তাঁর সামনে আবির্ভূতা হয়ে বলেন, ব্রহ্মার দেওয়া ঐ মন্ত্র জপ করলে তুমি আমার দর্শন পাবে না। তুমি মহাচীনে যাও, সেখানে গিয়ে বুদ্ধদেবের কাছ থেকে আমার সাধনা শিখে এস। তবেই তুমি সিদ্ধিলাভ করবে। বশিষ্ঠদেব মহাচীনে যান। গিয়ে দেখেন যে বুদ্ধদেব মদ্য, মাংস এবং নারীদের সঙ্গে নিয়ে দেবীর সাধনা করছেন। তিনি মহাচীন থেকে এই সাধনা শিখে আসেন এবং ভারতে এসে তা প্রচার করেন।

এই সাধনপ্রথাকে বলা হয় পঞ্চমকারের সাধনা। এর অপর নাম চীনাচার। এটিকে চীনাচার বলা হয় এই কারণে যে মহাচীন থেকে এই প্রথা ভারতবর্ষে এসেছিল। মারণ উচাটন বশীকরণ প্রভৃতি প্রয়োগকার্যে এই সাধনপ্রথারও নাকি প্রয়োজন হয়। কাজেই পূর্বদিকে সম্ভবত কামাখ্যাকে কেন্দ্র করে এই তিব্বতীয় প্রথা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এবার তন্ত্র-আলোচনা ছেড়ে দিয়ে আমরা সাধারণ মানুষের দু-একটা প্রয়োগবিধি নিয়ে আলোচনা করি। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে দুটি রাস্তা যেখানে পরস্পর মিলিত হয়েছে, সাধারণ ভাষায় যাকে বলে চৌরাস্তা, সেইখানে অনেক সময়ে তুক্-তাক করা হয়। বিহার ও উত্তর-প্রদেশে এ প্রথা খুবই প্রচলিত। প্রায়ই দেখা যায় যে চৌরাস্তায় বাতি জ্বালা অথবা ফুল ও জল পড়ে আছে। এমন কি অতি আধুনিক শহর চণ্ডীগড়েও আমি নিজে এ দৃশ্য দেখেছি। সাধারণ লোক এগুলিকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে কোন রকমে স্পর্শ করে ফেললে কিছু অমঙ্গল ঘটবে; অর্থাৎ যার বাড়িতে কোন অমঙ্গল হয়েছে সে এই প্রক্রিয়া করে গেছে এবং তার বাড়ি থেকে অমঙ্গল চলে এসে স্পর্শকারীর নিজের বাড়িতে ঢুকবে। গুজরাটের কোন কোন উপজাতিদের মধ্যে একটি অদ্ভুত প্রথা আছে। কার্তিকমাসের প্রথম দিনে তারা তাদের ঘর ঝাঁট দিয়ে সমস্ত ময়লা একটি পাত্রে করে চৌরাস্তার উপরে রেখে দেয়, বিশ্বাস যে, যে এটি স্পর্শ করবে এ বাড়ির সমস্ত অমঙ্গল তার বাড়িতে চলে যাবে। ঠিক এইরকম ভাবেই রেখে দেওয়া হয় বসন্ত রোগীর গায়ের ছাল। Crooke তাঁর লিখিত Popular Religion and Folk Lore of North India গ্রন্থে এইরকম অনেক আজগুবি প্রথা সন্নিবেশিত করেছেন। বোম্বাই অঞ্চলে যেখানে তিনটি রাস্তার মিলন হয়েছে সেখান থেকে সাতটি পাথরের টুকরা এনে কোন লোকের উপর কারও কুদৃষ্টি পড়লে তার গায়ে ঘসে পাথরগুলি ফেলে দেওয়া হয়।

গ্রামের সীমানায় এই ধরনের তুক্তাক্ করার প্রথা আমরা অনেক আদিবাসীদের মধ্যেও পাই। তাদের বৈগা বা ওঝারা গ্রামের প্রান্তভাগে মদ বা অন্য কোন জিনিস প্রতি বৎসর একটা নির্দিষ্ট সময়ে ছড়িয়ে দেয় যাতে অন্য গ্রামের অপদেবতারা সে গ্রামে আর না ঢুকতে পারে। কোন কোন আদিবাসীরা এই উদ্দেশ্যে আবার গ্রামের সীমানায় গিয়ে পশু বলি দেয়।

এইরকম আদিবাসীদের প্রথা আমাদের কিন্তু একটা বৈদিক প্রথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ঋগ্‌বেদের মধ্যে আমরা দেখি যে রুদ্র একজন অমঙ্গলকারী দেবতা এবং তিনি জনপদের প্রান্তে বাস করেন যাতে তাঁর অমঙ্গল করবার ক্ষমতাটা আর্য-জনপদের ওপারে অর্থাৎ অনার্যদের মধ্যে কাজ করে। এইখানে একটা কথা স্মরণীয় যে রুদ্র প্রথম শিব অর্থাৎ মঙ্গলকারীরূপে আমাদের সামনে হাজির হন যজুর্বেদে যেখানে তাঁকে সম্বোধন করা হচ্ছে ত্বং শিবনামোঽসি। এর পর থেকেই রুদ্র-শিব হলেন মঙ্গলময়।

তান্ত্রিকদের কাজ কিন্তু বেশির ভাগই হয় শ্মশানে, যেখানে অস্থি, চিতা-ভস্মকে আশ্রয় করে ভূতপ্রেতের নৃত্য চলে বলে বিশ্বাস করা হয়। তান্ত্রিকরা বিশ্বাস করেন যে এইসব মারণ উচাটন ব্যাপারে অপদেবতাদের কাজে লাগান যায়। এঁরা অনেক সময়ে উলঙ্গ হয়ে এবং বিভিন্ন দ্রব্যাদি মারফৎ তাঁদের প্রক্রিয়াবিধির আচরণ করে থাকেন।

৬

এতক্ষণ আমরা ভারতীয় প্রয়োগবিধি নিয়ে আলোচনা করছিলুম। ভারতের বাইরেও এই ধরনের কুসংস্কার যথেষ্ট দেখা যায়। ভারতবাসীরাই শুধু যে মারণ উচাটন বশীকরণ ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে, এই ধারণা পোষণ করলে আমরা সত্যই ভুল করব। অন্য জাতিদের মধ্যে, এমন কি সুসভ্য জাতিদের মধ্যেও যাঁরা নিজেদের জ্ঞানী বলে জাহির করে থাকেন, আমরা এই সবের নজীর তাঁদের মধ্যেও পাই। পশ্চিম এশিয়ায় হিব্রু জাতিদের মধ্যে এইরকম অনেক প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সব প্রথাকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরা যে আলোচনা করেছেন তাতে আমরা দেখি যে তাঁরা এগুলি সবই বিজাতি বা বিদেশী প্রভাবের মধ্যে ফেলতে চান। হয়ত এটা খুবই সম্ভব যে প্রাচীন মিশরীয়, অ্যাসীরীয় বা সুমেরীয় সংস্কৃতির ছাপ এর মধ্যে খানিকটা খুঁজে বের করা যায়। কিন্তু তাই বলে যে ইহুদী জাতি একেবারেই সংস্কারমুক্ত, তাদের মধ্যে কোনও কুসংস্কারের ছাপ ছিল না বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে পড়ে, বিশেষ করে Old Testament পুস্তকখানি যদি আমরা একটু মনোযোগ সহকারে পড়ি। যাই হোক, আমাদের মত ভারতবাসীর পক্ষে, বিশেষ

করে যাদের পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের লেখার উপর নির্ভর করতে হয়, জোর করে এখানে কিছু না বলাই বোধহয় সমীচীন।

কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি থেকে আমরা জানতে পারি যে Druidরা অনেক রকম মন্ত্র ব্যবহার করত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে। এর কতকগুলি ছিল অপরের ক্ষতিসাধন, কতকগুলি নিজের মনোবাঞ্ছা পূরণ। সেনাবাহিনীর সঙ্গেও রণক্ষেত্রে গমন করত Druid ওঝারা যাতে তারা মন্ত্রবলে নিজের পক্ষের সৈন্যদের শক্তিবৃদ্ধি ও বিপক্ষ দলের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করতে পারত। প্রাচীন পুঁথি থেকে প্রমাণিত হয় যে এসব ওঝারা ছিল মারণ উচাটন বশীকরণ কার্যে পণ্ডিত ও সুদক্ষ। সাধারণ সমাজে এসব মন্ত্র ব্যবহার করত মহিলারা, বিশেষ করে বৃদ্ধা মহিলারাই বেশী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইউরোপের অনেক জায়গাতেই Witch doctors আছে যাদের নাম রেজেষ্ট্রীভুক্ত এবং প্রয়োজনমত এসব রেজেষ্ট্রী অফিস থেকে তাদের ঠিকানা নিয়ে সাধারণ মানুষ তাদের কাছে হাজির হতে পারে। এদের অনেকেই ভয় করে চলে এবং ইতিহাসের পাতায় দেখি Joan of Arc-কে Witch ভেবে নিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে পড়েছিলুম যে মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলায় এভাবে একজনকে হত্যা করা হয়েছে এবং যারা এ অপকার্য করেছে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। বস্তার জেলার ঘটনাটা ঘটেছিল অশিক্ষিত এবং তথাকথিত অসভ্য উপজাতির মধ্যে, আর Witch doctorরা বাস করছেন সুসভ্য পাশ্চাত্য জগতে। মানুষের যুক্তিহীন বিশ্বাসের বা কুসংস্কারের পটভূমিকায় তাহলে শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নেই। আমাদের সাজসজ্জা এবং শিক্ষার পিছন থেকে আদিম মনটা যে সময় সময় উঁকি মারে এই কুসংস্কারে বিশ্বাস তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। Plinyর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে একজন রোমের নাগরিক Druidদের মন্ত্রপুত একটি তাবিজ রাজদরবারে নিয়ে যাবার জন্য দণ্ডিত হয়েছিলেন। এ থেকে এটুকু বোঝা যায় Druid ওঝাদের খ্যাতি ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্বাস করা হত যে তারা স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব দূর করতে পারে এবং মানুষের ব্যাধি দূর করে সৌভাগ্য আনতে পারে; আবার প্রয়োজন হলে এরা মারণ উচাটন করতে পারে, এমন কি একজনের দারিদ্র্য অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার ক্ষমতাও এদের ছিল।

খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বশীকরণ মারণ উচাটন ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে অনেক পুস্তক রচনা করা হয়েছে। একটা বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, যেমন আমাদের মধ্যেও আছে, যে এইসব কাজ করতে গেলে বিশেষ শুভ দিনক্ষণের প্রয়োজন। যেমন ঠিক সূর্যোদয়ের পূর্বে যখন পূর্বদিকভালে আলোর রেখা ফুটে ওঠে সেই সময়ে মানুষের উপকারের জন্য ক্রিয়াকর্ম প্রশস্ত। মধ্যরাত্রি গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন এবং তখন কোন কাজ করা উচিত নয়, black magic চলতে পারে। দুই রাস্তার সংযোগস্থলে অর্থাৎ চৌমাথায় যে তুকতাক্ করা হয় এটা আমাদের দেশে একটা প্রচলিত রীতি একথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। Westermarck তাঁর Origin and Development of Moral Ideas (২৫৬ পৃঃ) গ্রন্থে এই ধরনের কিছু কিছু ব্যাপার খ্রীষ্টসমাজে দেখে এই অনুমান করেছেন যে দুটি রাস্তার সংযোগস্থল Cross-এর মত। তাই মানুষ সেখানে আশ্রয় নেয় নিজের দুঃখদুর্দশা লাঘবের জন্য। এ মতটা অবশ্য কতটা সমীচীন তা বিচার করে দেখবার মত ক্ষমতা আমার নেই। খ্রীষ্টধর্ম ভক্তির ধর্ম এবং সেবাব্রতকে অতি মহৎ কাজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই কারণে হয়ত মারণ উচাটন অন্তত গোঁড়া ধর্মবাদীদের মধ্যে সেরকম প্রচলিত ছিল না। সাধারণ মানুষের মধ্যে অবশ্য এর কিছু কিছু নজীর ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখতে পাই, তবে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে সেগুলির বেশির ভাগই এসেছে অখ্রীষ্টান সমাজ থেকে। যেমন Gnostic খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এর প্রচলন সম্ভবত প্রাচীন মিশর থেকে এসেছিল।

৭

প্রয়োগবিধির কিছু নিদর্শন নিয়ে আমরা আলোচনা করলুম। সব যুগে এবং সব মানুষের মধ্যে এর প্রচলনের প্রমাণ ইতিহাস রেখে গেছে। মানুষ সভ্য হয়ে এই কুসংস্কারের উপর একটা বাতাবরণের সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আবরণের তলায় আদিম মানুষের এবং আধুনিক মানুষের ভূমিকা একই। মনস্তাত্ত্বিকরা এর কি বিশ্লেষণ করবেন জানি না, কারণ তাঁদের মধ্যে আমরা বিভিন্ন মতবাদ দেখতে পাই। যাই হোক Frazer তাঁর The Golden Bough গ্রন্থে একটি বড় মূল্যবান কথা বলেছেন যেটা আমরা

এখানে আলোচনা করতে পারি। তিনি দেখিয়েছেন যে আদিম মানুষের মধ্যে দুটি বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। প্রথমটি হল, জগতে যা ঘটছে তার অনেকটাই আমাদের আয়ত্তাধীন। দ্বিতীয় বিশ্বাসটি হল, আমাদের আয়ত্তের বাইরে বহু ঘটনা ঘটে যেগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় বিশ্ববিধাতার ইচ্ছায়, আর এই বিশ্ববিধাতাকে কোন রকমে খুসী করতে পারলেই আমরা সব কিছু কাম্য পেতে পারব। এই দ্বিতীয় ধারাকে কেন্দ্র করেই ধর্ম এবং magicএর প্রবর্তন। একদল যেমন ভাবে যে ধর্মের দ্বারা বা ধর্মের আশ্রয় নিলে সব দুঃখই দূরীভূত হবে, আর একদলের তেমনি বিশ্বাস যে কতকগুলি বিশিষ্ট প্রক্রিয়ারও প্রয়োজন আছে। অবশ্য যদি এ মত মেনে নেওয়া হয় যে আগে magicএর উৎপত্তি তারপর ধর্মের, তাহলে এইটেই বলতে হবে যে ধর্ম হল প্রয়োগবিধির মার্জিত সংস্করণ।

ধর্ম এবং magicএর মূলে কিন্তু আমরা একটা প্রগাঢ় বিশ্বাসের অস্তিত্ব লক্ষ্য করি, আর আমাদের বিশ্বাস যত বিকৃত হয় ততই এসে পড়ে magicএর প্রভাব। ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের যেমন একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে, অযৌক্তিক বিশ্বাস তেমনি ততটা ঘৃণ্য। এই অযৌক্তিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে প্রয়োগ-বিধি বা magic বরাবর তার একটা নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করে এসেছে। যুক্তিহীন গোঁড়ামি মানুষকে অন্ধ করে, কিন্তু এই গোঁড়ামির মূলে রয়েছে অন্ধ বিশ্বাস। প্রাচীন Babylonএর মন্দিরের পুরোহিতদের কাছে সদ্য-বিবাহিতা যুবতীকে রেখে আসা হত ছিন্নপুষ্পা করার জন্য এবং পরে স্বামী এসে স্ত্রীকে নিয়ে যেতেন পুরোহিতের প্রসাদ হিসাবে। অন্ধ বিশ্বাস বা অন্ধ ভক্তি মানুষকে কতটা নামিয়ে নিতে পারে বোঝা যায় যখন আমরা দেখি ভারতবর্ষের কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুরূপ প্রথার প্রবর্তন। প্রসাদ আমার চাই কারণ তাতে আমার মঙ্গল হবে। আর আমার এই মঙ্গলের জন্য আমি প্রয়োগবিধিরও আশ্রয় নিতে পারি, তাতে কোন দোষই হবে না। মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি জঘন্য প্রথার মূলে রয়েছে এই মনোবৃত্তি। যেখানে আমরা ধর্মকে নিজের বা অপরের উপকারের উদ্দেশ্যে লাগাই, সেখানেও আমরা আদর্শভ্রষ্ট। হয়ত কাজটা ethical ; ethicsএর সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ তা নিয়ে পণ্ডিতরা অনেক গবেষণা করেছেন, কিন্তু আমাদের ধর্মের যে আদর্শ শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হয়েছে সেটা শুধু ethical নয়, সেটা ethicsএর উপরে আরও অনেকটা। যোগের সাহায্যে মনকে চাওয়া পাওয়ার উর্দ্ধে তুলে নিয়ে

যেতে হবে, যেখানে ethics বা unethics কিছুরই নাগাল পৌঁছয় না। Ethicsএর পর্যায়ে নামলেই ধর্মের মধ্যে ঢুকে পড়ে সেই সব প্রয়োগবিধি যাতে মানুষের মঙ্গল হয়, যার উদাহরণ আমরা পূর্বেও দিয়েছি। আর তার নীচের পর্যায়ে আসে মারণ উচাটন বশীকরণ, যেটা ধর্মকে কলুষিত করেছে। এই সব প্রয়োগবিধির আশ্রয় নেয় তারারই, যারা কুসংস্কারে মগ্ন।

নরবলি

দুর্বলের উপর সবল চিরদিনই অত্যাচার করে। প্রকৃতির রাজ্যে এইটাই বোধহয় নিয়ম। আমরা বলে থাকি বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, জোর যার মুল্লুক তার ইত্যাদি, যার দ্বারা প্রকৃতির এই নিয়মটা আমাদের চোখের সামনে পরিস্ফুট হয়। এই নিয়মের সংস্কৃত পরিভাষা হল মাৎস্যন্যায়, অর্থাৎ ছোট মাছকে বড় মাছ যেমন খেয়ে ফেলে, তেমনি সব দুর্বল প্রাণীকেই সবল প্রাণী গ্রাস করে। ধর্মশাস্ত্রকাররা বলেছেন যে রাজার প্রধান কর্তব্য হল তাঁর রাজ্যকে মাৎস্যন্যায় থেকে রক্ষা করা অর্থাৎ শাসকের ভয়েই সবলরা দুর্বলদের উপর অত্যাচার থেকে বিরত থাকে। কয়েকটি দেশে দেখা গেছে যে মৃত্যুদণ্ড রহিত করায় সে দেশে হত্যার সংখ্যা বেড়ে গেছে, এমন কি মৃত্যুদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান থাকা সত্ত্বেও। দণ্ডই মানুষকে সুপথে চালিত করে, বলেছেন স্বয়ং মনু। এই দণ্ডের ভয় যদি না থাকত জগতে আসত বিশৃঙ্খলার রাজত্ব, দুর্বল বিলুপ্ত হয়ে যেত সবলের অত্যাচারে। Indian Penal Code-এর ৩২০ ধারাটি তুলে দিলে আজ বোধহয় ভারতে রক্তপাতের আর অন্ত থাকত না।

ধর্মের ক্ষেত্রেও আমরা এই মাৎস্যন্যায় বিধানের ব্যতিক্রম দেখি না, অথচ এর ব্যতিক্রম হওয়া উচিত ছিল এ ক্ষেত্রে। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে ভগবান তথাগত একবার নৃপতি বিম্বিসারকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে শত শত মূক পশুকে দেবতার নামে বলি দিয়ে কোন পুণ্য অর্জন হয় না। বিম্বিসার নাকি তথাগতের এই অহিংসার বাণী গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল রাজগৃহে, আধুনিক রাজগীর, বিহারের অন্তর্গত পাটনা জেলায়। মহাভারত পাঠে আমরা জানতে পারি যে এই রাজগৃহে বিম্বিসারের বহু পূর্বে আর একজন রাজা রাজত্ব করতেন, নাম জরাসন্ধ। যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করতে উদ্যত তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেন, মহারাজ, এ যজ্ঞের এখন সময় নয়। দেখুন, জরাসন্ধ শত শত নৃপতিকে ধরে এনে বন্দী করে রেখেছে, পশুপতির মন্দিরে বলি দেবার জন্যে। যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় ভীম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে

রাজগৃহে যান, সেখানে জরাসন্ধকে হত্যা করে কারারুদ্ধ নৃপতিদের উদ্ধার করেন।

জরাসন্ধ বলবান, এ রাজারা ছিলেন দুর্বল, তাই জরাসন্ধ এঁদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিলেন। চিরকালই রাজায় রাজায় লড়াই হয়, এক রাজা অপরকে হত্যা করে, তার রাজ্য গ্রাস করে। কিন্তু যদি এই হত্যা ধর্মের পর্যায়ে আনা হয়, তখনই হয় বিপর্যয়; ধর্ম হয় কলুষিত। দণ্ডের ভয় না রাখলে আজও হয়ত দেবস্থানে অবাধে নরবলি চলত। অধিকাংশ মানুষই একে ঘৃণা করে এবং অতীত যুগেও করত। অথচ প্রায় পৃথিবীর সব জায়গাতেই ছিল এ প্রথার প্রচলন। ধর্মের ক্ষেত্রে এটাই দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার; এর আর একটা রূপ শিশুবলি ও সতীদাহ। যে সব ধর্মতত্ত্বজ্ঞেরা বলি প্রথার পক্ষে যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করেন, তাঁরা বলেন যে বলির ফলে ঐ প্রাণীর আত্মা মুক্তিলাভ করে এবং পরমব্রহ্মে লীন হয়। শত জন্ম সাধনাতেও যে মুক্তি অর্জন করা সম্ভব নয়, যূপকাষ্ঠে প্রাণ নিবেদন করলে সেই মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু দেখবেন যিনি এই যুক্তি দিচ্ছেন সেই ধর্মতত্ত্বজ্ঞকে আপনি যদি একবার বলেন যে এই সহজ মুক্তির পথটা আপনি বেছে নিন না, প্রস্তাবটা শুনে তিনি শিউরে উঠবেন।

মহেঞ্জোদরোতে খননকার্য পরিচালনা করবার সময় Sir John Marshall কতকগুলি শিলমোহর আবিষ্কার করেন এবং তার একটি থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে প্রাগ্ঐতিহাসিক সিন্ধুদেশবাসীদের মধ্যে নরবলির প্রথা প্রচলিত ছিল! কিন্তু এ মতটা কতদূর সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত তা বিচার না করেই পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ এটিকে গ্রহণ করেছেন। শিল-মোহরে যে ছবিটা রয়েছে সেটাতে দেখা যাচ্ছে যে একজন নারী হাত জোড় করে প্রণাম করতে উদ্যত এবং তার পাশে আর একজন পুরুষ খড়্গ হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। এই চিত্রটি থেকে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় কিনা ভাববার বিষয়, কারণ যদি এ থেকে বলি সম্বন্ধে কিছু অনুমান করতেই হয় তাহলে সে অনুমানটা হবে নারীবলিকে কেন্দ্র করে। নারীকে বলি দেওয়া হত কিনা তার প্রমাণ বার করা মুস্কিল। এর একটি উদাহরণ আমরা পাই ভবভূতির লেখা 'মালতীমাধবম্' নাটকের পঞ্চম অঙ্কে। অঘোরঘণ্ট দেবী চামুণ্ডার কাছে মালতীকে বলি দিতে উদ্যত যখন মাধব এসে তাকে উদ্ধার করে। নারীবলির উদাহরণ প্রকৃতপক্ষে আমরা খুব বেশি একটা পাই না।

নারীকে সতী করে চিতার আগুনে তুলে দেওয়া হত এবং তার উপর অনেক রকম অত্যাচারই হয়ত করা হত, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে সরাসরি নারীবলির বিধান খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। কাজেই যদি আমরা বিশ্বাস করি যে মহেঞ্জো-দরো-সভ্যতা পরবর্তীযুগে বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়, তাহলে একটি মাত্র শিলমোহর থেকে নারীবলি সম্বন্ধে অনুমান করা হয়ত যুক্তিসঙ্গত হবে না। যাই হোক, এ নিয়ে এখনি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কোন পক্ষেরই উচিত নয়। হয়ত, কোন কোন অঘোরী সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে পরবর্তীযুগে এই প্রথার প্রচলন হয়, যার ছবি আমরা ভবভূতির নাটকে পাই। অঘোরী-শৈবরা কিন্তু অর্বাচীন, গুপ্তযুগের আগে তাদের অস্তিত্বের আভাস বোধ হয় মেলে না।

বৈদিক যুগে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল কিনা তা নিয়েও মতভেদ আছে। ঋগ্‌বেদের মধ্যে সম্ভবত এর সুস্পষ্ট আভাস কোথাও নেই। যজুর্বেদ এবং পরবর্তী ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আমরা পুরুষমেধ যজ্ঞের উল্লেখ পাই। যজুর্বেদের মধ্যে যে মন্ত্রটি আছে সেটি কিন্তু বড় চমৎকার এবং কৌতূহলোদ্দীপক। বিভিন্ন দেবতাকে আহ্বান করা হচ্ছে এবং তাঁদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি বলির ব্যবস্থা; যেমন ব্রহ্মার জন্য একজন পুরোহিত, নদীদেবতার জন্য একজন জেলে ইত্যাদি (বাজসনেয়ী সংহিতা, ১—১২)। একদল ঐতিহাসিক মনে করেন যে এইরকম পুরুষমেধ যজ্ঞে কোন পুরুষকেই যথার্থ বলি দেওয়া হত না, দেবতার নামে তাদের উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া হত। এই মতের সপক্ষে তাঁরা যুক্তি দেখান যে শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এই প্রক্রিয়ারই উল্লেখ রয়েছে। আর একদল ঐতিহাসিক ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের যুক্তি হল যে শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থটি বাজসনেয়ী সংহিতার অনেক পরে লেখা। এর উপরে ভিত্তি করে যজুর্বেদের যুগে কি হত তা প্রমাণ করা যায় না। আর যদি বলি দেওয়া নাই হোত, তাহলে এইভাবে দেবতার উদ্দেশ্যে 'বলি দিচ্ছি' বলে একটা মন্ত্র পাঠ করার অর্থ কি? তাঁদের মতে শতপথ ব্রাহ্মণের সময়ে নরবলি প্রথাটা সম্ভবত লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তার প্রতীক মাত্র ব্যবহৃত হত।

কি হোত তা নির্ণয় করার উপায় সত্যই আজ আমাদের হাতে নেই। তবে এটা আমরা জানি যে ভারতসভ্যতার একটা বিচিত্র রূপরেখা সব যুগে এবং সব সময়েই প্রতিভাত হয়েছে। এখানে একবার যে ধারাটা প্রবর্তিত হয় সেটা পরিবর্তিত হতে অনেক সময় লাগে, তা সে আমাদের চোখে আজ

ভালই লাগুক বা মন্দই লাগুক। অনেক সময় জোর করে আইন মারফত তা রোধ করতে হয়, যেমন শিশুবলি ও সতীদাহের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। কবিগুরু এইটারই ইঙ্গিত করেছেন, একটি মধুর ছত্রে, আজও দেখ সেই কটাক্ষ, আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য, যেমনটি ঠিক দেখা যেত কালিদাসের কালে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পরিপ্রেক্ষিতে এই সব যুক্তিতর্ককে টেনে আনতে আমরা বাধ্য হয়েছি, এইটাই প্রমাণ করার জন্য যে বৈদিক যুগে নরবলির প্রতীক মাত্র প্রচলিত ছিল, বলিপ্রথা নয়।

যাই হোক, ইতিহাস যখন সোজা কিছু সাক্ষ্য রেখে যায় নি, তখন কোন পক্ষই জোর করে কিছু বলতে পারেন না। সতীদাহ সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় আমরা দেখবো যে আর্যজাতির যে শাখা ভারতে এসেছিলেন তাঁরা সম্ভবত অন্য আর্যদের চেয়ে বেশি সভ্য। আর্যদের আদি বাসভূমিতে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু অথর্ববেদ সাক্ষ্য দেয় যে ভারতের সুসভ্য আর্যগণ এর প্রতীক মাত্র অবলম্বন করেছিলেন। সুতরাং এটা ভাবা বোধ-হয় অসঙ্গত হবে না যে আর্যদের আদি বাসভূমিতে হয়ত নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। ভারতে আগত সুসভ্য আর্যশাখা এটাকে মার্জিত করে তার প্রতীক মাত্র অবলম্বন করেছিলেন।

আর্যদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষা পর্যালোচনা করে ভাষাতত্ত্ববিদরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে আর্যজাতির আদিভূমিতে নরবলি প্রথার প্রচলন ছিল। তাঁরা দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এই জঘন্য প্রথার আভাস বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়। উত্তর ইউরোপের আর্যভাষা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই প্রথা বিদ্যমান ছিল যুদ্ধ জয়কে কেন্দ্র করে। যুদ্ধ-বন্দীদের দেবতার স্থানে নিয়ে গিয়ে বলি দেওয়া হত। অন্যদিকে দক্ষিণ ইউরোপের অনেক জায়গায়, বিশেষ করে Gaulদের মধ্যে, কোন লোকের জীবন বিপন্ন হলে তাকে রক্ষা করবার জন্য সমাজের নীচুস্তরে আর একটি জীবন বলি দেওয়া হত। এটা অনেকটা আমাদের দেশের 'নিশিডাকার' মত। সত্য কথা বলতে কি এখানেও আমরা অনেকটা অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াচ্ছি। কি কারণে এ প্রথার উদ্ভব তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এ প্রথার প্রচলন সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব নেই। একদল পণ্ডিতের মত হল এই যে আর্যজাতির মধ্যে এই জঘন্য প্রথার উদ্ভাবন হয় যখন তারা অনার্যদের সংস্পর্শে আসে। আর্যরা তাদের আদি বাসভূমিতে অন্য জাতির সংস্পর্শে এসেছিল এটা Moller

প্রমুখ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। এঁদের মত হল যে প্রাচীন আর্যরা তাদের আদি বাসভূমিতে একদিকে এসেছিল Semeticদের সংস্পর্শে এবং অন্যদিকে Finno-Ugrianদের। এখন সত্যই Semetic অথবা Finno-Ugrianদের কাছ থেকেই প্রাচীন আর্যরা নরবলি শিখেছিল, না এটা তাদের নিজস্ব প্রথা, এর মীমাংসা বোধ হয় কোনদিনই হবে না।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ প্রায়ই বলে থাকেন যে আর্যদের যত প্রাচীন শাখা তার মধ্যে সংস্কৃতিতে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রীকরা। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ আর্যদের মধ্যেও আমরা এই জঘন্য প্রথার প্রচলন দেখতে পাই ; পাই না কিন্তু সোজা-সুজিভাবে বৈদিক আর্যদের মধ্যে। তাহলে কারা বেশি সভ্য? Hellenic heritage বলতে ইউরোপের পণ্ডিতেরা পঞ্চমুখ ; ঠিক তেমনি তারা পঞ্চমুখ প্রমাণ করতে যে ভারতের প্রাচীন আর্যরা অতটা সভ্য নয়। যাই হোক, আমরা Homerএর Illiad (XXIII, 175)এর মধ্যে দেখতে পাই যে Achilles বার জন Trojanকে Patroclusএর চিতায় বলি দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকরা এটাকে বলেন গ্রীক সভ্যতার ব্যতিক্রম মাত্র। পরবর্তী গ্রীক লেখকগণ অবশ্য নরবলির প্রভূত নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন যে এটা বর্বর জাতির আচার, কোন সুসভ্য জাতি এর অনুসরণ করতে পারে না। কিন্তু আমরা Plutarchএর লেখা Themistoclesএর জীবনী থেকে জানতে পারি যে Salamis যুদ্ধের পূর্বে তিনি জনমতের চাপে তিনজন ইরাণীয় বন্দীকে দেবমন্দিরে বলি দেবার হুকুম দিয়েছিলেন। এ বর্ণনার মধ্যে একটা বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। Themistocles এ কাজটা করেছিলেন নাকি জনমতের চাপে। এ থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে সাধারণ গ্রীকদের মধ্যে এ রকম একটা প্রথা সম্ভবত প্রচলিত ছিল। Grote অবশ্য তাঁর ইতিহাসে এটাকে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। এত বড় একজন ঐতিহাসিক এ বিষয়ে কেন এরকম একটা মত পোষণ করলেন তা বলা শক্ত, কারণ প্রাচীন গ্রীসে অন্য সূত্র থেকেও আমরা নরবলির উদাহরণ পেয়ে থাকি, তবে হয়ত এটা সত্য যে এ প্রথা সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল, শিক্ষিতদের মধ্যে নয়। কিন্তু শিক্ষিতরাও সাধারণ মতের চাপে এ প্রথার অনুসরণ করতে বাধ্য হতেন, বিশেষ করে যখন যুদ্ধ বা কোন দৈবদুর্বিপাক এসে হাজির হত। সাধারণ মানুষ সব সময়েই এ সব দেবতার রোষ হিসাবে ধরে নেয় এবং বিভিন্ন উপায়ে দেবতাকে তুষ্ট

করবার চেষ্টা করে। যেমন Athensবাসীদের মধ্যে একটা প্রথা ছিল যে তারা নীচ জাতির কিছু কিছু লোককে প্রতিপালন করত এবং দেশে যখন দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি হত তখন এদের বলি দেওয়া হত দেবস্থানে, দেবতার রোষ নিবৃত্তির জন্য। Arcadiaব Lycaeus পর্বতে Zeusএর সম্মানার্থে প্রতি বৎসর নরবলির ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষিত সমাজ এটাকে বন্ধ করবার জন্য সব সময়েই সচেষ্ট ছিলেন এবং অনেক সময় শিক্ষিত জনমতের চাপে এর প্রতীক মাত্র ব্যবহৃত হত। অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে গ্রীকদের মধ্যে নরবলি প্রথার উদ্ভাবন হয়েছিল অসভ্য জাতিদের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে। আমরা জানি যে আর্যরা গ্রীসে যখন বসতি স্থাপন করেন তখন সে দেশে একদল অনার্য জাতি বাস করত। কিন্তু তাদের মধ্যে নরবলি প্রথার প্রচলন ছিল এবং তাদের সঙ্গে আর্যদের সংমিশ্রণের ফলে আর্যদের মধ্যে এ প্রথা ছড়িয়ে পড়ে এর সোজাসুজি প্রমাণ আমরা পাই না। তবে এটা প্রায় প্রত্যেক দেশেই দেখা যায় যে আদিম এবং অসভ্য সমাজে এ প্রথার প্রচলন, এবং পরবর্তী যুগে যখন আদিম এবং সভ্যসমাজে একটা সংমিশ্রণ ঘটে তখন সভ্যরাও আদিম দেবতার ভয়ে ভীত হয়ে প্রথাটা মেনে নিতে বাধ্য হয়। একটা অজানা ভয় কাজ করতে থাকে,—এটা না মানলে আমাদের অমঙ্গল হবে অথবা আমাদের সুখের পথ রুদ্ধ হবে। এখানেও সেই চিরন্তন চাওয়া-পাওয়ার খেলা। আমার সুখের জন্য, আমার কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য একটা প্রাণ নষ্ট হয় হোক। এই চাওয়া-পাওয়ার জোয়ার যেমন চলেছে আদিম বর্বর মনে তেমনি চলেছে সভ্যজগতে। কাজেই বাইরে সভ্যতার আমরা যতই বড়াই করি মনের নিভৃত কোণে সভ্য এবং অসভ্যের কোন তফাত নেই। সবাই চাওয়া-পাওয়ার দাস। আর এর সঙ্গে ওতঃপ্রোত-ভাবে মিশে গেছে আমাদের তথাকথিত ধর্ম। কুসংস্কার ধর্মকে গ্রাস করে আছে সর্বযুগে, সর্বসমাজে। ধর্ম মারফত আমাদের মুক্তি যতটা প্রয়োজন, বোধহয় আমাদের মারফত ধর্মের মুক্তিও ততটা বাঞ্ছনীয়।

আমাদের বিষয়বস্তু থেকে সামান্য একটু সরে গিয়ে এখানে আর একটা আলোচনা করা বোধহয় অসঙ্গত হবে না। যদি এটা ধরে নিলে হয় যে গ্রীসের আর্যরা নরবলি প্রথা প্রথমে জানত না এবং পরে আদিম জাতির সংস্পর্শে এসে তাদের সমাজে প্রথাটির বিস্তার লাভ ঘটে তাহলে এই সিদ্ধান্তেই পৌছতে হয় যে আর্যদের আদিভূমিতে অন্তত একদল মানুষ ছিল যারা

নরবলি প্রথাকে আমল দেয় নি। আবার উপরের আলোচনা-প্রসঙ্গে এও আমরা দেখেছি যে জনমতের চাপে শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও এ প্রথাকে সমর্থন করতে হয়েছে। তাহলে জিনিসটা দাঁড়ায় এইরকম : আর্যদের আদিভূমিতে একদল এ প্রথা মেনে চলত আর একদল এটাকে গ্রহণ করে নি; আদিম সমাজের সংস্পর্শে এসে মানুষের সাধারণ স্তরে এ প্রথাটা ছড়িয়ে পড়ে এবং শিক্ষিত সমাজ এটাকে আমল দেয় নি। এরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছলে আমাদের খানিকটা ঐতিহাসিক বিভ্রান্তির মধ্যে এসে পড়তে হয়। কারণ, পূর্বেই দেখেছি যে আদিমতম আর্যদের মধ্যে এ প্রথার প্রচলন সম্ভবত ছিল। সুতরাং দোষটা আদিম জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে প্রকৃত ইতিহাস সুসভ্য গ্রীকজাতিকে এই কলঙ্ক থেকে স্খালন করতে পারে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের দরদ আমরা অনুভব করি কিন্তু গ্রহণ করতে পারি না। তাতে ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গীকে কলঙ্কিত করা হয়।

এই প্রসঙ্গে গ্রীস দেশের পাশে ইতালীতে যে রোমক আর্যরা বাস করত তাদের দিকে চাইলেই বিষয়টা আর একটু পরিষ্কার হবে। এদের মধ্যে নরবলি প্রথা নিঃসন্দেহে প্রচলিত ছিল এবং তা দেখে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, কারণ তারা অন্যদিকে যতই সুসভ্য হোক মানুষের জীবনের মূল্য কখনই দিতে শেখে নি। যে জাতি তাদের দাসদের হিংস্র সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে বাধ্য করত এবং তাদের ভয়াবহ মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে আনন্দে করতালি দিত, জাতিতে তারা আর্যই হোক বা অন্য কিছুই হোক, মানবিকতার ইতিহাসে বর্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। আশ্চর্যের বিষয় যে এখানেও আমরা দেখি জোর করে একটা ইতিহাস লেখার ধারা। W. Warde Fowler তাঁর The Religious Experience of the Roman People (London, ১৯১১) গ্রন্থে প্রাচীন রোমকদের মধ্যে যে নরবলি প্রথার প্রচলন ছিল তা স্বীকার করে লিখেছেন যে প্রথাটার উৎপত্তি সম্ভবত প্রাচ্য ভাবধারার প্রভাবে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই ধরনের একটা প্রচেষ্টা প্রায়ই দেখা যায়। পাশ্চাত্যের যা কিছু খারাপ তার সবার মূলে প্রাচ্য প্রভাব আর প্রাচ্যের যা কিছু ভাল তা সবই এসেছে প্রতীচ্যের কাছ থেকে। ইতিহাসকে বিকৃত না করে যদি এটা প্রমাণ করা যেত তাহলে বলবার কিছু ছিল না। সব ঐতিহাসিকই স্বীকার করবেন যে প্রাচ্যের অনেক ভাল জিনিসই প্রতীচ্যের দান। তাই বলে জোর করে একটা

মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এটা আর যাই হোক ইতিহাস নয়। Pliny লিখেছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব ৯৭ অব্দে রোমের দেবমন্দিরে Druidদের বলি দেওয়ার প্রথা বন্ধ করা হয়। Slav জাতির মধ্যে খ্রীষ্টানদের বলি দেওয়া অথবা প্রাচীন জার্মান জাতিরা তাদের দেবতা Woden—Mercuryর নিকট যে নরবলি দিত সেও কি প্রাচ্য প্রভাবে? গোঁড়ামি কোন ক্ষেত্রে ভাল নয়, ধর্মেও নয়, দর্শনেও নয়, ইতিহাসেও নয়।

২

প্রাচীন চীনারা সুসভ্য জাতি। সভ্য জগতে তাদের দান অপরিসীম। তাদের দিকে চাইলেও আমরা তাদের মধ্যে এ জঘন্য প্রথার অস্তিত্ব লক্ষ্য করি। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকে এক কবরে ভরে দেওয়া অথবা কোন রাজা বা নেতৃস্থানীয় কেউ মারা গেলে তার কবরে তার দাসদাসী রক্ষিতা প্রভৃতিকে শায়িত করার প্রথার প্রচলন আমরা প্রাচীন চীনের ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই। চীনে যখন বিরাট পাচিল গাঁথা হয় তখন নরবলি দেওয়া হয়েছিল বলে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন; উদ্দেশ্য—দেবতা খুশি হয়ে প্রাচীর মজবুত রাখবেন, বিদেশীর হাত থেকে দেশকে বাঁচাবেন। কোন বিপদ উপস্থিত হলেও নরবলি দেওয়া হত। অনেক সময়ে যুদ্ধবন্দীদের হৃদ্‌যন্ত্র দেহ থেকে বার করে নিয়ে দেবতার কাছে উৎসর্গ করা হত। গত শতাব্দীর প্রথম ভাগেও চীনে একটা অদ্ভুত প্রথার প্রচলন ছিল। হত্যাকারীর দেহের কিছুটা অংশ অথবা হত্যাকারীকে বলি দেওয়া হত নিহতের আত্মার তৃপ্তির জন্য। J. H. Gray লিখেছেন যে চীনের কোন কোন আদিম জাতি প্রত্যেক বৎসর একটি কুকুরের মূর্তির সম্মুখে নরবলি দিত দেবতাকে খুশি করার জন্য। যেমন গ্রীসে তেমনি চীনেও সভ্য এবং শিক্ষিত সমাজ এ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন, কিন্তু ফল বিশেষ হয় নি। সব দেশে যেমন, চীনেও তেমনি শাসকরাই এ প্রথার শেষ পর্যন্ত মূলোচ্ছেদ করেছেন।

আর একটা সুসভ্য জাতির কথা ধরা যাক, প্রাচীন মিশরীয়রা। এদের জ্ঞান-গরিমা, সাহিত্য, কারুশিল্প আজও আমাদের বিস্ময়ের বস্তু। এরাও নরবলি দিত দেবতাকে খুশি করবার জন্য অথবা পরলোকে রাজারাজড়াদের ভোগসামগ্রী জোগাবার জন্য। Diodorus প্রাচীন যুগের একজন রাজার

কথা বলেছেন যিনি একবার আরক্ত রঙের একজন মানুষকে Osiris-এর উদ্দেশ্যে বলি দিয়েছিলেন। এ থেকে এই ধরনের একটি প্রথা মিশরে বেশ চালু ছিল যে এরকম রঙের কোন লোক দেশে পাওয়া না গেলে বিদেশ থেকে বলি আমদানী করা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে সূর্যের উদ্দেশ্যে নরবলি দেওয়া হত। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ অবধি প্রতি বৎসর একটি যুবতীকে নীলনদের জলে ভাসিয়ে দেওয়ার প্রথা ছিল, কারণ মিশরবাসীরা বিশ্বাস করত যে এতে নীলনদের জল সারা বৎসর ধরে বৃদ্ধি পাবে।

মধ্যযুগে ইহুদীদের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা ঘৃণা করত এই ভেবে যে এদের মধ্যে একটা গোপনীয় পূজার প্রচলন আছে, যাতে খ্রীষ্টান শিশুদের রক্তের প্রয়োজন হয়। এই সংস্কারের বশবর্তী হয়ে অনেক সময়েই কোন লোক অপঘাতে মারা গেলে সেটিকে ইহুদীদের মন্ত্রচালনার ফল বলে বিশ্বাস করা হত এবং নিরীহ ইহুদীদের রক্তে হত এদের প্রায়শ্চিত্ত। অভিশপ্ত ইহুদীজাতি অনেক দিক দিয়েই লাঞ্ছিত। শত শত নিরীহ ইহুদীকে ধরে হিটলার বলি দিয়েছিলেন দানবীয় প্রথায়। এটা অবশ্য ধর্মের ব্যাপার নয়, নেহাতই রাজনীতির খেলা।

৩

আমরা দেখেছি যে আমাদের দেশে বৈদিক যুগে নরবলি প্রথা ছিল না, তার প্রতীক মাত্র ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীযুগে নরবলি কিন্তু ধর্মের একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। সুসভ্য ভারতের আর্যরা কেন ধর্মের ক্ষেত্রে এই জঘন্য প্রথার প্রবর্তন করলেন তার কারণ নির্ণয় করা সত্যই কঠিন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরেই, অথবা বৈদিক যুগের শেষের দিকে, আর্যদের সঙ্গে ভারতীয় আদিবাসীদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়। দাস অথবা শূদ্র হিসাবে এই আদিবাসীরা আর্যসমাজের মধ্যে স্থানলাভ করে। তখন দুই দলের সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার এক সমন্বয় ঘটে এবং এর ফলে আর্যধর্মে এসে পড়ে এই জঘন্য প্রথা। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে নরবলি ভারতের অনার্যদের প্রথা এবং পরবর্তীযুগে আর্যধর্মের মধ্যে হয় এর প্রবেশ।

আর একদল ঐতিহাসিক এর জন্য দায়ী করেন Scythianদের। Scythianরা আধুনিক Chinese Turkistan এবং Russian Turkistan বরাবর বাস করত। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে এরা Indo-Iranian গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাহলে এদের আর্য বলেই স্বীকার করতে হবে। ভারতে

এরাই হল শক এবং কুষাণ জাতি এবং এরা বহুদিন যাবৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্য প্রদেশের পশ্চিমাংশে রাজত্ব করেছে। অধ্যাপক Sylvan Levi ভারতীয় সংস্কৃতি ভাণ্ডারে এদের দানের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। এদের কোন ক্রমেই অসভ্য বা বর্বর জাতি বলা যায় না।

নিরপেক্ষভাবে ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে আর্য-সমাজে নরবলি প্রথা কোন একটা বিশেষ স্তর থেকে আসে নি। এটি বিভিন্ন স্তর থেকে প্রবাহিত বিভিন্ন ধারার সমন্বয়। Proto-Austroloid এবং Proto-Mongoloidদের মধ্যে নরবলি বন্ধ করবার ব্যবস্থা বৃটিশরাজ করে গেছেন। এর পূর্বে তাদের এ বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা ছিল এবং তাদের ধর্মের ব্যাপারে কেউ হাত দিতে সাহস করে নি! এই Proto-Mongoloid এবং Proto-Austroloidদের সঙ্গে আর্যদের সংমিশ্রণ ঘটে এবং তখন চলে আসে আর্য সমাজে এই দানবীয় প্রথা।

Herodotus এর বর্ণনা থেকে Scythianদের মধ্যে নরবলির আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পাই। চীনাদের মত এদেরও কোন রাজা মারা গেলে মৃতের স্ত্রী, ভৃত্য এবং অন্য পরিচারকবর্গকে রাজার সঙ্গে কবরে ভরে দেওয়া হত। আরও একটি বিশেষ প্রথা এদের মধ্যে ছিল। রাজার মৃত্যুর এক বৎসর পরে তাঁর কবরের ধারে পঞ্চাশজন অনুচরকে নিয়ে গিয়ে গলা টিপে মেরে ফেলা হত। তারপর চলত এই মৃতদেহ নিয়ে রাজার কবরকে প্রদক্ষিণ এবং পরে রাজকবর মাঝখানে রেখে এদের মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করা। Herodotus আরও একটি অদ্ভুত রকমের নরবলির কথা বলেছেন। একটি বিরাট মঞ্চের উপরে Aresএর মূর্তি রাখা হত এবং একজন যুদ্ধবন্দীকে নিয়ে গিয়ে সে মূর্তির সামনে হত্যা করা হত। হত্যার পূর্বে ঐ হতভাগ্যকে বাধ্য করা হত মাথা নীচু করে বসতে এবং তার সঙ্গে ব্যবস্থা ছিল কলসী থেকে তার মাথায় মদ ঢেলে দেবার। হত্যার পর দেবতার কাছে দেওয়া হত তার রক্ত এবং তার দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হত।

ভারতে যে নরবলি প্রথার প্রচলন তার মূলে সম্ভবত এই সব বিভিন্ন জাতির প্রভাব রয়েছে। ক্রমে ক্রমে এখানে নরবলি ধর্মের একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। চণ্ডিকা এবং কালীর কাছে নরবলি দিয়ে পুজা করা হত। শৈব অঘোরীরাও কোন কোন ক্ষেত্রে শিবকে তুষ্ট করার জন্য নরবলি দিতেন।

কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে যে নরবলি পেলে মহাদেবী সহস্র বৎসর তুষ্ট হয়ে থাকেন। আরও বিশ্বাস করা হত, যে ব্যক্তিকে মহাদেবীর নিকট এই-ভাবে মন্ত্রপূত করে বলি দেওয়া হয় তার হয় অক্ষয় স্বর্গলাভ। অপরকে স্বর্গলাভ করাবার এমন সোজা পন্থা যে মহাত্মা আবিষ্কার করেছিলেন, নিষ্ঠুর ইতিহাস তাঁর নাম অমর করে রাখে নি। কালিকাপুরাণের আরও বিধান যে, যদি কেউ পীড়িত বা কোন প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাহলে তার মাতা অথবা বিবাহিত হলে তার স্ত্রী নিজের রক্ত দিয়ে দেবীকে তুষ্ট করতে পারেন। কিছুদিন আগেও বাংলা দেশে এইরকম একটি প্রথা প্রচলিত ছিল, হয়ত এখনও আছে। মাতা অথবা স্ত্রী কামনা করেন পুত্র অথবা স্বামীর রোগমুক্তির জন্য এবং এই রোগমুক্তির পর দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিনে অথবা কালীপূজার রাত্রে দেবীকে খুশি করার জন্য বুক চিরে রক্ত দেন। তিনি ভক্তিগত চিত্তে প্রতিমার সামনে উপবেশন করেন, তখন নাপিত এসে নরুণ দিয়ে গলার নীচে একটু চিরে রক্ত বার করে একটি বিল্বপত্রে দেয় এবং পুরোহিত মহাশয় এই বিল্বপত্রটি জগদম্বিকার উদ্দেশে নিবেদন করেন। এটা নরবলির একটা প্রতীক। আরও হতে পারে, তান্ত্রিক মতে দেবীর সামনে কোন নারীকে বলি দেওয়া যায় না ; তাই এই রকম একটা প্রথার প্রচলন। ভবভূতির 'মালতীমাধবম্' নাটকের মধ্যে যে নারী বলি প্রচেষ্টার উল্লেখ আমরা পাই, সেটা অঘোরী শৈব প্রথা, তান্ত্রিক শাক্ত প্রথা নয়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়। আমাদের শক্তি-পূজার অনেকখানিই এসেছে Proto-Austroloidদের কাছ থেকে। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের একটি শ্লোক স্বভাবতই মনে আসে :

বিন্ধ্যে চৈব নগশ্রেষ্ঠে তব স্থানং হি শাশ্বতম্।
কালি কালি মহাকালি সিধুমাংসপশুপ্রিয়ে ॥

এই বিন্ধ্যে এবং তার অরণ্যে আজও বাস করে শবর পুলিন্দ ইত্যাদি Proto-Austroloid জাতি। সম্ভবত এদের মধ্যে যে মাতৃপূজার প্রচলন ছিল তাতে শুধু মদ মাংস ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হত না, নরবলিও দেওয়া হত। মধ্যপ্রদেশের Bastar জেলায় দাণ্ডেশ্বরীর মন্দিরে নরবলি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল এবং বৃটিশ শাসকগণ বাধ্য হয়ে এ প্রথাটিকে বেআইনি ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, কোচবিহারেও দেবীর নিকট নরবলি দেওয়া হত। এ প্রথাটি সম্ভবত এসেছিল Proto-Mongoloidদের প্রভাবে। কাজেই

নরবলি যে শাক্ত-উপাসনার একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? এর প্রভাব তন্ত্রের উপরেও এসে পড়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এটা তান্ত্রিক পুজার একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। আর্যধর্ম এইভাবে ক্রমে ক্রমে বিধর্মীদের প্রভাবে তার নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। এখন আমাদের সমাজে আর্যধর্মের যেটুকু আছে, সেটুকু হ'চ্ছে কঙ্কাল মাত্র, তার মেদ, রক্ত, শিরা, উপশিরা সবই অনার্য, এসেছে হয় Proto-Austroloid বা Proto-Mongoloidদের কাছ থেকে অথবা Proto-Dravidianদের কাছ থেকে। বিদেশী প্রভাবও যে এর উপর পড়ে নি তা নয়। এ নিয়ে পণ্ডিতেরা অনেক গবেষণা করেছেন। এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

শৈব অঘোরীরাও নরবলি দিত। শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যেও বহু অনার্য উপাদান রয়েছে। এদের পাশুপত শাখা আর্যধর্মের মূল ধারার পরিপন্থী। পরবর্তীযুগে এই পাশুপত শাখার অনেক উপশাখা ছড়িয়ে পড়ে যার একটি হল অঘোরী। গুপ্তযুগের পূর্বে সম্ভবত অঘোরী সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্ব ছিল না, এটি গুপ্তোত্তর সম্প্রদায়। মহাভারত পাঠে আদি পাশুপত সম্প্রদায়ের স্বরূপ আমরা খানিকটা জানতে পারি। শান্তিপর্বে দক্ষযজ্ঞের যে বর্ণনা সেটা এ পাশুপত সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে। পশুপতি দক্ষের দ্বারা নিমন্ত্রিত হন নি। তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে মহেশ্বর নিজেই বলেছেন :

মহেশ্বর উবাচ

স্থরৈরেব মহাভাগে পূর্বমেতদনুষ্ঠিতম্।
যজ্ঞেষু সর্বেষু মম ন ভাগ উপকল্পিতঃ॥
পূর্বোপায়োপপন্নেন মার্গেণ বরর্ণিনি।
ন মে স্থরাঃ প্রযচ্ছন্তি ভাগং যজ্ঞস্য ধর্মতঃ॥

(১২, ২৮৩, ২৬-২৭)

বর্ণনা প্রসঙ্গে আরও জানতে পারি মহেশ্বরের নিজের কথায়—

বেদাৎ ষড়ংগাদুদ্ধৃত্য সাংখ্যযোগাচ্চ যুক্তিতঃ।
তপঃ স্থতপ্তং বিপুলং দুশ্চরং দেবদানবৈঃ॥
অপূর্বং সর্বতোভদ্রং সর্বতোমুখমব্যয়ম্।
অব্দৈর্দশাহসংযুক্তং গূঢ়মপ্রাজ্ঞনিন্দিতম্॥
বর্ণাশ্রমকৃতৈর্ধর্মৈর্বিপরীতং কচিৎসমম্।
গতান্তৈরধ্যবসিতমত্যাশ্রমমিদংব্রতম্॥

ময়া পাশুপতং দক্ষ শুভমুৎপাদিতং পুরা।
তস্য চীর্ণস্য তৎসম্যক্‌ফলং ভবতি পুষ্কলম্‌॥
(১২, ২৮৪, ১২২-১২৩)

উপরের বর্ণনা থেকে এইটেই বোঝা যায় যে পাশুপত ধর্মের দেবতা আর্য-সমাজে বিশেষ স্বীকৃতি পাননি। এর কারণ সম্ভবত যে এ সম্প্রদায় বেদ-বিরোধী না হলেও চতুর্বর্ণাশ্রমবিধিবিরোধী, আর এই বর্ণাশ্রমধর্ম না মানার ফলে এর মধ্যে অনেক আর্যেতর মতবাদ প্রবেশ করে। তার সঙ্গেই আসে নরবলির প্রথা। ইতিহাস যে সাক্ষ্য প্রমাণ রেখেছে তা থেকে বোঝা যায় যে প্রাচীন যুগে বিহার, উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম ভারতেই পাশুপত ধর্মের প্রাধান্য ছিল। কাপালিক বা অঘোরীরাও প্রধানত পাঞ্জাব, উজ্জয়িনী এবং দক্ষিণ ভারতে বাস করত। ভারতের অন্যান্য স্থানেও মধ্যে মধ্যে এরা এসে হাজির হয় এবং তখন হয় একটা ভীতি এবং ত্রাসের সঞ্চার। মানুষ ব্যস্ত থাকে নিজের প্রাণ বাঁচাতে।

সুপণ্ডিত রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাঁর The Indo-Aryan Races গ্রন্থে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে আমাদের ধর্মের যে সমস্ত কদর্য প্রথা তার প্রচলন হল Outer-Band of the Aryans অধ্যুষিত অঞ্চলে। অনেক ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে ভারতে দু'বার দু'দলে বিভক্ত হয়ে আর্যরা তাঁদের আদিভূমি থেকে এসেছিলেন। প্রথম দলটি এসে বসতি স্থাপন করেন পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। পরে দ্বিতীয় দলটি এসে তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তাঁরা সরে যান গঙ্গা-যমুনা বিধৌত অঞ্চলে এবং নবাগতরা এঁদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েন এঁদের বেষ্টন করে, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, বিহার, বাংলা প্রভৃতি দেশে। গঙ্গা-যমুনার দেশের লোকেরা Inner-Band of the Aryan Groups এবং তাদের ঘিরে আছে Outer-Bandএর আর্যরা। (Grierson প্রমুখ পণ্ডিতগণ দু'বার আর্যদের ভারতে আগমনের কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন যে প্রথম দলটি যারা পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বসবাস স্থাপন করেছিল, তারা দ্বিতীয় দলের চাপে রাজস্থান, উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এরাই Outer-Band এবং পরে যারা আসে তারা বসতি স্থাপন করে গঙ্গা-যমুনা দেশে এবং তারা Inner-Band—এ মতটি কিন্তু খুব সমীচীন মনে হয় না)। যাই হোক এই Outer-Band আর্যরাই মিশে যায় বিশেষভাবে অনার্যদের

সঙ্গে এবং এদের দেশেই আমরা প্রধানত নরবলির প্রথা দেখতে পাই। 'প্রধানত' বলা উচিত এই কারণে যে Inner-Band দেশের দু'-এক জায়গায়, বিশেষ করে পর্বতাঞ্চলে, যেখানে অনার্যরা বাস করে সেখানে এই প্রথা দেখা যায়। যেমন, চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ এই গঙ্গা-যমুনার দেশেই স্বয়ং বলির হাত থেকে কোন রকমে নিস্তার পেয়েছিলেন। বিবরণীটি এইরকম :

"...The pilgrim left Ayudha in a boat along with a party and proceeded east down the Ganges towards Ayamukha. When about 100 li on the way, in a wood of asoka trees, the boat was attacked by Thugs who robbed the party. When these thugs saw that the Chinese pilgrim was an uncommonly fine-looking man they decided to sacrifice him to their cruel deity Durga. From this terrible fate the pilgrim was preserved by a providential hurricane which put the wicked Thugs in fear, and made them release their doomed victim, treat him with awe and reverence, and under his teaching give up their wicked profession and take the vows of lay-Buddhists."

(Watters, On Yuan Chwang, I. p. 360)

এই ঠগদের নিয়ে পরে আমরা আলোচনা করব। এরা দেবীর কাছে বলি দিয়ে ডাকাতি করতে বেরুত। ধর্মের কি পরিণাম!

৪

যাই হোক, যখন আমরা গ্রীক রোমক মিশরীয় Semetic Slav tCel Tuton জাপানী ও আফ্রিকার এবং আমেরিকার বিভিন্ন আদিম জাতি প্রভৃতির মধ্যে এ প্রথার প্রচলন দেখতে পাই, তখন এটি বুঝতে হবে যে সর্বযুগে এবং মানুষের সর্বস্তরে ধর্মের মধ্যে একটা পঙ্কিলতা থেকে গেছে। এই পঙ্কিলতাকে অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। মনস্তাত্ত্বিকরা হয়ত এই চিন্তাধারার একটা বিশেষ কারণ খুঁজে বার করবেন এবং অনেকে সেটা করেছেন। তাঁরা যে কারণই দেখান এটা ঠিক যে সবার উপরে রয়েছে ধর্মের গোঁড়ামি এবং ধর্মান্ধতা। ধর্মকে এই গোঁড়ামি এবং অন্ধতাই চিরদিন কলুষিত করেছে এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য যুগে যুগে দেবতাত্মাদের আবির্ভাব হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে

ষোড়শ শতাব্দীতে Industrial Revolution আসার পূর্বে পৃথিবীর সর্বত্রই সমাজ এবং ধর্ম একীভূত ছিল। এই বিপ্লবের পর ইউরোপে আসে rationalism-এর যুগ, যখন মানুষ সমাজ এবং ধর্মকে প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে শেখে। একজন লেখক বলেছেন যে আমরা যেমন অপরাধীকে আজ আইনের যূপকাষ্ঠে স্থাপন করি তেমান প্রাচীন জাতিরা অপরাধীকে স্থাপন করত ধর্মের যূপকাষ্ঠে এবং এই থেকেই নরবলি প্রথা চালু হয়। এ মতটা হয়ত খানিকটা সত্য, কিন্তু পুরাপুরি নয়; কারণ যদিও অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে—অসভ্য কেন অনেক সুসভ্য প্রাচীন জাতির মধ্যেও—অপরাধীদের বলি দেওয়া হয়, তেমনি যারা নিরপরাধ তাদের ধর্মের যূপকাষ্ঠে প্রাণ হারাতে হয়েছে। দেবতাকে তুষ্ট করবার জন্য ছিল বলির ব্যবস্থা। আর তুষ্ট করা মানেই হল যে পূর্বে তিনি রুষ্ট হয়েছিলেন, হয়ত বা ব্যক্তিবিশেষের পাপে বা কোন জাতির পাপে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর "দেবতার গ্রাস" কবিতায় রাখালকে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন তার মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য। ইতিহাসের পাতায় বহু নজীর আছে জাতির পাপের জন্য একজন বা কয়েক জন মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। এগুলো সবই ধর্ম বা ধর্মান্ধতার কুফল। মানুষ যখন জীবনের সব বিপর্যয়কে দেবতার অভিশাপ বলে গ্রহণ করত, তখন দেবতাকে খুশি করবার জন্য যে সব ব্যবস্থা করত, তার মধ্যে একটা হল নরবলি। ষোড়শ শতাব্দীর বিপ্লবের পর ইউরোপের অনেক জাতি বুঝল যে তারা ধর্মের নামে কি অধর্ম করেছে। কিন্তু জগতের অন্যান্য জায়গায় সে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়তে অনেকদিন লেগেছিল। তাই বেশির ভাগ লোকই আজও মনে করে জগতের যা কিছু কাম্য, যা কিছু প্রাপ্য, সবই আসবে পূজাপদ্ধতির মাধ্যমে, দেবতাকে খুশি করতে পারলে, আর এ বলি হল দেবতাকে খুশি করবার এক অঙ্গ। Westermarck তাঁর Origin and Development of Moral Ideas গ্রন্থে এই জঘন্য প্রথার পিছনে মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলি বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন। যত বিশ্লেষণই করা হোক শেষ পর্যন্ত এসে পড়ে ঐ দুটি কথায়,—চাওয়া এবং পাওয়া, যাকে ভিত্তি করে আমাদের জীবনের চিরন্তন ঘাত-প্রতিঘাত। যখের ধন থেকে আরম্ভ করে আমাদের পরকালের পাথেয় সবই আমরা খুঁজেছি এই চাওয়া-পাওয়ার মাধ্যমে, কিন্তু একমাত্র বিশ্ববিধাতাই জানেন চাওয়া-পাওয়ার পথটা নররক্তে কতটা সুগম হয়।

ডাকাতের ধর্ম

জ্ঞানভিত্তিক যে ধর্ম সেই ধর্মই প্রধান। যে ধর্মমত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তার পরিণাম শুভ হতে পারে না, অর্থাৎ সে ধর্ম মানুষকে তার যথার্থ ইষ্ট বা মুক্তি দিতে পারে না। উপনিষদের ঋষিরা বার বার এই বিষয়টার উপর জোর দিয়ে গেছেন। জ্ঞানই প্রকৃত পন্থা। গীতার মধ্যে শ্রীভগবান তিন রকম সাধনার কথা বলেছেন, যা কর্ম, জ্ঞান বা ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমেই তিনি বলেছেন বৈদিক ক্রিয়াকর্মের কথা। যারা তিন বেদ, অর্থাৎ ঋক, সাম ও যজুঃ জ্ঞাত হয়ে, সোম পান করে স্বর্গপ্রাপ্তির মানসে যজ্ঞাদি করে, তারা দেবলোকে যায়, কিন্তু কৃতকর্মের ক্ষয় হলেই আবার জগতে ফিরে আসে; এইভাবে তারা জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে (৯, ২০—২১)। কিন্তু যে ভগবানকে প্রকৃতরূপে জানতে পারে, অর্থাৎ যে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হয়, সেই কেবল পরমব্রহ্মে লীন হয়ে যায় (৯, ২২)। যে পুত্র, পুষ্প, জল দিয়ে ভক্তিবিমগ্নচিত্তে ভগবানের সাধনা করে, সেও শেষে ভগবানের কাছে পৌঁছায় (৯, ২২)। এর কোনটাই হেয় বা নিকৃষ্ট নয়। কিন্তু শ্রীভগবান বার বার বলেছেন যে প্রকৃত জ্ঞানী, ভগবচ্চরণে প্রকৃত আত্মসমর্পণ-কারীই মুক্তির সন্ধান পায়। তাকে আর জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে হয় না।

কিন্তু প্রকৃত সাধক জগতে কজন আছেন? মুখে বড় বড় কথা অনেকেই বলেন, ভিতরে কিন্তু বেশির ভাগই কামনার দাস। দেবতা এদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করাবার একটা কামধেনু মাত্র। দেবতাকে একবার কামধেনুর পর্যায়ে নিয়ে গেলে আমরা যে তাঁকে কোথায় নামিয়ে আনি তার হদিশ নেই। প্রথমে আমরা চাই তিনি আমাদের অর্থ দিন, সমৃদ্ধি দিন, সুখ দিন। তিনি আমার যারা সুখের পথের অন্তরায় তাদের নিধন করুন। আর এক পর্যায় নীচে নিয়ে গিয়ে আমরা চাই তিনি আমাদের দুষ্কর্মের সহায়ক হোন; তিনি আমাদের জয়যুক্ত করুন। এসব ক্ষেত্রে ভক্তির যে কোনরকম অভাব থাকে, তা নয়। ভক্তিভরেই এরা পুজা করে, দেবতার

নাম গান করে। কিন্তু জ্ঞানের অভাবে ভক্তি যে কতটা বিকৃত রূপ নিতে পারে তা ইয়ত্তা করা যায় না।

কালী কৈবল্যদায়িনী। সাধকেরা এঁর পুজা করেন কৈবল্যপ্রাপ্তির আশায়। আবার পুজা হয় রক্ষাকালীর। যখন দেশে কোন মহামারী এসে উপস্থিত হয়, তখন এই রক্ষাকালীর পুজা করা হয়। এতে ফলও হয়। কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে যে এখানে আমাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা কৈবল্যদায়িনী জগজ্জননীকে একধাপ নীচে নামিয়ে আনি। অবশ্য এতে যে দোষ একটা খুব আছে তা নয়। সংসারী যে তাকে খানিকটা কামনা-বাসনা রাখতেই হবে, তা না হলে সংসার অচল হয়ে যাবে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিভিন্ন গির্জাতেও প্রার্থনা করা হত জগতে শান্তির জন্য। এসব ক্ষেত্রে কামনার আবেষ্টনের মধ্যে ভগবানকে টেনে আনলেও দোষ বিশেষ নেই, কারণ এতে সবারই মঙ্গল অমঙ্গল কোন লোকের হবে না। আপত্তি তখনই, যখন আমরা আমাদের নিকৃষ্টতম কাজের হাতিয়ার হিসাবে দেবতাকে টেনে আনি।

এমনি একটি হাতিয়ার হলেন ডাকাতে-কালী বা ভবানী বা ডাকাতদের দেবী। এঁর পুজা হত দেশ জুড়ে, সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে হিমালয় অবধি। ভক্তও ছিল অনেক, যারা ভক্তিভরে এঁর পূজা করত, মুক্তি বা মোক্ষলাভের আশায় নয়। কামনা শুধু একটি যেন তাদের ডাকাতিতে তারা সফলকাম হয়, শিকার যেন ফসকে না যায়। তাদের ধারণা মা তুষ্টা হলেই তাদের জয় অনিবার্য। এরাই অভিশপ্ত চম্বলের মানসিং দলের পূর্বপুরুষ। মানসিংকে কতকগুলি বিষয়ে বিবেচনা করলে তার সুখ্যাতি করতেই হবে। সে ছিল ভক্ত, ধ্যানধারণায় দিন কাটাত, গরীবদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করত, কিন্তু সে অর্থ সংগ্রহ করত ধনীদের হত্যা এবং লুঠ করে। ধনীদের একা দেশের সব অর্থ পুঞ্জীভূত করে ভোগ করবার অধিকার নেই। সে অর্থ সমভাবে বণ্টন করতে হবে। আইন যদি না করে তাহলে বলপ্রয়োগ প্রয়োজন। এটা communismএর যেমন একটা বীভৎস ব্যাখ্যা, ধর্মেরও তেমনি।

এখানে স্বভাবতঃই আর একটা প্রশ্ন মনে জাগে, communism কি তাহলে আর একটা ধর্ম, আর এই ডাকাতদলের বিকৃত ব্যাখ্যায় এ দুটি সমপর্যায়ভুক্ত হয়েছে? Communismএ ধর্মের কোন স্থান নেই; সে মতবাদে থাকতেও পারে না। Massকে কেন্দ্র করেই যদিও সে মতবাদ,

সেখানে Massএর স্বাধীন opinionএর কোনও স্থান নেই। যা হোক এসব আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এসব ডাকাতরা কিন্তু তাদের ধর্ম, চিন্তাধারা এবং বৃত্তিকে একসঙ্গে মিলিয়ে একটা অদ্ভুত মতবাদের সৃষ্টি করেছে যার বিশ্লেষণ আজও ভাল করে হয় নি। ধার্মিকেরা যেমন এটাকে বলবেন জঘন্য, তেমনি জঘন্য বলবেন রাজনীতিক এবং শাসকেরা।

একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, ভারতবাসীরা সব জিনিষের পিছনেই ধর্মকে টেনে আনে। হ্যাঁ, আনে মারণ, উচাটন, বশীকরণের পিছনে, এমনকি ডাকাতির পিছনেও। ধর্ম এটা নিশ্চয়, কিন্তু এটা কোন শ্রেণীর ধর্ম? জ্ঞানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যেখানে আবেগভরে চাওয়া-পাওয়ার স্তরে ধর্মকে নামান হয়, এটা হল সেই শ্রেণীভুক্ত। নরবলি আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্ কিভাবে বলি হতে হতে বেঁচে যান। এই যে নরঘাতকের দল, এরাই হল ঠগদের পূর্বপুরুষ, তবে এদের মধ্যে এবং ভবানী-ভক্ত ডাকাতদলের মধ্যে, যাদের পরবর্তী যুগে ঠগ বলে গণ্য করা হয়—খানিকটা প্রভেদ আছে। হুয়েন সাঙকে যারা বলি দিতে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে পরিব্রাজকের ধনরত্ন লুঠ করবার কোন অভিপ্রায় ছিল কিনা জানা যায় না, পরবর্তী ঠগদের মধ্যে এই বৃত্তিটাই কিন্তু অতি উৎকট। ঠগ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'স্থগ' ধাতু থেকে যার অর্থ হল গোপন করা। এ থেকে আর এক ধাপ এগিয়ে মানে করা হয়েছে যারা গোপনে প্রতারণার সাহায্যে অসৎ কর্ম সাধন করে। আমরা আজ ঠগ শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহার করে থাকি। দোকানদার অসাধু উপায় অবলম্বন করে ব্যবসায়ে লাভ করলে সেও আমাদের কাছে ঠগ, সন্ন্যাসীর বেশে দুটো মিষ্টি কথা বলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হবে, এই আশীর্বাদ করে যে ফাঁকি দিয়ে অর্থ নিয়ে যায় সেও ঠগ, আবার বাড়ির ঝি বা চাকর গোপনে কিছু আত্মসাৎ করলে তাকেও আমরা বলি ঠগ। এই ঠগ থেকেই সাধারণ চলতি কথা এসেছে ঠকান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জগতে সেটা একটা মহান ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কালবাজার, এটাও ঠগদের কীর্তি।

আমরা এই ঠগদের প্রথম উল্লেখ পাই 'শ্রীকণ্ঠচরিত' গ্রন্থে। পণ্ডিতরা মনে করেন যে, এটি লেখা হয়েছিল ১১৫০ অব্দ নাগাদ। এই সময়ের কিছু পূর্ব থেকে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বড় জটিল হয়ে দাঁড়ায়। ভারতে তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য যে যার নিজের তাল সামলাতে ব্যস্ত। জাতীয়তাবোধ লুপ্ত-

প্রায়। ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে মারামারি, কাটাকাটিতে মত্ত, কে টিকে থাকবে, কে কতটা লাভ করবে। পশ্চিমদিকে মুসলমান আক্রমণ তখন শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু জাতীয়তাবোধের এমনই অভাব যে সেদিকে কারুর লক্ষ্য নেই ; এক হয়ে বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করার কোন প্রচেষ্টাই নেই। এই অবস্থার সুযোগে অভ্যুত্থান ঘটে ঠগদের। এরা অধিকাংশই ব্যবসাবাণিজ্য করত এবং বাইরে সৎ জীবনযাপনের একটা ভান দেখাত। ভিতরে ভিতরে এরাই কিন্তু ডাকাতের দল সৃষ্টি করত। এদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এরা যে রাজ্যে বাস করত, ডাকাতি করত সে রাজ্যের সীমানার বাহিরে। ডাকাতি শেষে ধনরত্ন নিয়ে ফিরে আসত নিজের দেশে। যে দেশে ডাকাতি ঘটত সে দেশের শাসকদের এরা তখন নাগালের বাইরে। আর নিজের দেশে রাজকর্মচারীদের লাভের একটা অংশ দিয়ে বশীভূত করে রাখত যাতে তারা ধরাছোঁয়ার মধ্যে না পড়ে। তাদের বৃত্তির এইটাই ছিল পদ্ধতি। ডাকাতি করার পর কি করে আইনকে ফাঁকি দিতে হয় তার পদ্ধতিটা এদের বেশ জানা ছিল। সারা দেশ জুড়ে যখন এই রকম অরাজকতা চলছে তখন বিভিন্ন রাষ্ট্র এক হয়ে এর প্রতিকারের কোন চেষ্টাই করে নি। আধুনিক extradition treatyর মত যদি একটা বন্দোবস্ত থাকত তাহলে হয়ত ঠগরা এত অবাধে তাদের ব্যবসা চালাতে পারত না।

এরা বৎসরে কয়েকমাস নিজেদের দেশে থাকত, তারপর বেরিয়ে পড়ত দলে দলে বিভিন্ন জায়গায়। যখন তীর্থযাত্রা করবার সময় আসত, ধর্মপ্রাণ যাত্রীরা যথাসর্বস্ব নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন দেবদর্শনের উদ্দেশ্যে। ব্যবসার উদ্দেশ্যে বণিকদের সময় সময় অন্যত্র যেতে হত। এই সব সময়ে সুযোগ বুঝে পথে এই ঠগরা তাদের সঙ্গ নিত। সাধুর বেশে এদের মন ভিজিয়ে ফেলত অথবা পাণ্ডা সেজে এদের পথপ্রদর্শক হত। এইরকম দু'একজন যেত তাদের সঙ্গে সঙ্গে আর দলের লোকরা থাকত কিছু দূরে। নির্জন অরণ্যপথে অথবা অন্য কোন নির্জন স্থানে এই সাধু বা পাণ্ডা ইঙ্গিত করামাত্র দলের অন্য লোকেরা এসে এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। তারপর হত্যা করে তাদের দেহ সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পুঁতে ফেলত। এই ঘটনার পরই তারা সদলবলে নিজেদের দেশে পালিয়ে যেত। ধরবার আর কোন উপায় নেই। হৃত অর্থের যথাযথ ভাগবাঁটোয়ারা চলত এবং রাজকর্মচারী থেকে দলের সামান্য লোকটি অবধি সকলেই ভাগ পেত।

পথে নির্জনে ডাকাতি সব দেশে সব যুগেই হয়; আইন যদি তার প্রতিবিধান করতে পারে ভাল, না করতে পারলে আমরা শাসকবর্গের দোষ দিই। এটা সব দেশের সব যুগের রীতি, কাজেই এ ব্যাপারকে কেন্দ্র করে আমরা যতই ক্ষুব্ধ হই ধর্মের দিক দিয়ে কিছু বলবার নেই, যদিও কাজটা অনৈতিক এবং সেই অর্থে অধর্মীয়। কিন্তু আপত্তি হয় সেইখানেই যেখানে ধর্মকে আমরা এই জঘন্য কাজের মধ্যে টেনে আনি এবং ধর্মকে আমরা এর একটা অঙ্গ করে গড়ে তুলি। কিন্তু ঠিক এইটাই হয়েছিল ঠগদের বেলায়। তারা নিজেদের এই বৃত্তিকে ধর্মের একটা অঙ্গ বলে মনে করত এবং ধর্মপ্রণোদিত হয়েই এ কাজটা করত। এ ধর্মটা কিন্তু sugercoated quinine tabletএর মত। জঘন্য পশুবৃত্তি, তার উপরের আবরণ ধর্ম। মনুষ্যত্বের এটাই একটা বৈশিষ্ট্য। একটা কোন জিনিস তা সে যতই খারাপ হোক, বারবার তাকে ভাল বলতে বলতে বিবেক ও বুদ্ধি এমন ভোঁতা হয়ে যায় যে তারা সেটাকে ভাল বলেই মনে করে। হিটলার ও আধুনিক যুগের অনেক রাজনীতিক এই যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। একটা মিথ্যাকে বারবার বল যে সেটা সত্য, সে মিথ্যাটা সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু সত্যে পরিণত হবে কার কাছে? যাদের বিবেক ও বুদ্ধি দুই ভোঁতা হয়ে গেছে তাদের কাছে। যারা বিকৃত-বুদ্ধি নয় তাদের কাছে এটা কোনদিনই সত্য বলে প্রতিভাত হবে না।

বংশানুক্রমে ঠগরা বিশ্বাস করতে শিখেছিল যে তারা যা করছে সেটা ধর্মেরই একটা অঙ্গ। তাদের ধারণা যে এ বৃত্তি স্বয়ং আদ্যাশক্তি সার্থক করেছেন। এ বিষয়ে তাদের মধ্যে একটি কিংবদন্তীও প্রচলিত ছিল এবং এই কিংবদন্তী তারা টেনে আনে পুরাণ থেকে। আদ্যাশক্তি যখন মহিষাসুর বধে লিপ্ত তখন তিনি দেখলেন যে মহিষাসুরকে তিনি যতবারই আঘাত হানছেন ততবারই তার প্রতি রক্তবিন্দু থেকে একটি করে অসুর জন্মাচ্ছে। আবার সে অসুরটিকে যখন তিনি আঘাত হানছেন, তার প্রতি রক্তবিন্দু থেকে আর একটি অসুর তৈরি হচ্ছে। তখন দেবী তাঁর নিজের দেহের ঘর্মবিন্দু থেকে দুজন মানুষ তৈরি করলেন এবং তাদের হাতে লম্বা একটুকরা কাপড় দিয়ে দিলেন। তারা এর সাহায্যে প্রত্যেক দানবের গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরে ফেলতে লাগল। এইভাবে দানবকুল নির্মূল হল। ঠগরা দাবী করে যে তারা এই দুজন লোকেরই বংশধর। সুতরাং দেবী তাদের

এই বৃত্তিরই ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছেন। অতএব এই বৃত্তি অনুসরণ করলে তাদের কোনই পাপ হবে না, দেবী তাদের রক্ষা করবেন।

ঠগরা যাই বিশ্বাস করুক, তাদের বিশ্বাসের মধ্যে কিন্তু একটা বিষয় লক্ষণীয়। মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে, নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে ভোঁতা করে কেমন নিঃসংশয়ে পাপবৃত্তি অবলম্বন করতে পারে। এতে তাদের মনে একটুও খোঁকা লাগে না। আমাদেব সমাজের অনেক স্তরে ধর্মের দোহাই দিয়ে এইরকম পাপ চলেছে, যেমন অস্পৃশ্যতা। তথাকথিত নীচ জাতিদের আমরা পশুব চেয়েও ঘৃণা করি। বাড়িতে ইঁদুর অথবা বিড়াল এলে বাড়ি অপবিত্র হয় না, কিন্তু অপবিত্র হয় একজন মানুষ ঢুকলে। এই যে মানুষের দেবতাকে অপমান ও অবজ্ঞা আমরা এর সাফাই গাই ধর্মের দোহাই দিয়ে। মনে মনে ভাবি এইটাই ধর্ম, দেবতা আমাদের এই ধর্মের মারফতেই রক্ষা করেন, অন্য পথে গেলে আমাদের রক্ষা নেই।

ঠগরা তাদের অভিযানে বার হবার পুর্বে প্রত্যেকবার ভক্তিভরে তাদের দেবীর পুজা করত। এই পুজায় বিশেষ কোন মূর্তি ব্যবহৃত হত না, পুজা হত একটি খড়্গের উপর। এই খড়্গকে তারা দেবীর প্রতীক বলে বিশ্বাস করত। এখানে আমরা তন্ত্রের খানিকটা বিকৃত প্রভাব লক্ষ্য করি। তন্ত্র অনুসারে বিভিন্ন যন্ত্রের পুজা হয়ে থাকে। এই যন্ত্র বা diagram বিভিন্ন রকমের, তারা বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতীক এবং তাদের পুজাও হয় বিভিন্ন ভাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই যন্ত্রকে সোনা, রূপা বা তামার পাতের উপর এঁকে রাখা হয় এবং বারমাস তার উপরেই পুজা চলতে থাকে। তন্ত্রমতে মূর্তি অপেক্ষা সেই যন্ত্রগুলি শ্রেয়। ঠগরা তাদের খড়্গকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করত। নিয়ম অনুসারে এর পুজা করা হত। খড়্গের উদ্দেশ্যে পশুবলি দেওয়া হত এবং ভক্তিভরে সকলে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করত। তারপর শুভ দিনক্ষণে, শুভলগ্নে তারা বেরিয়ে পড়ত তাদের বৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য। একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়; এরা আততায়ীকে সাধারণত ছোরা বা খড়্গ দিয়ে মারত না। গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলত। এদের ধারণা যে অসুরনিধনের সময়ে আদ্যাশক্তি এদের পুর্বপুরুষের হাতে এক বস্ত্র দিয়েছিলেন। সুতরাং বস্ত্রখণ্ড দিয়েই তাদের শিকার করতে হবে। খড়্গ বা ছোরা ব্যবহার করাটা বিধিসঙ্গত নয়। এটি বড় অদ্ভুত বিশ্বাস। একবার তারা ধর্মকে জঘন্য পর্যায়ে নামাল কুসংস্কারের মাধ্যমে, আর

সেই কুসংস্কারকে আবার অন্য কুসংস্কার দিয়ে আবৃত করে তারা তাদের ধর্ম বাঁচাল। এইরকম অনেক কুসংস্কারই এদের মধ্যে ছিল। যখন তারা তাদের অভিযানে বের হত, তখন তারা 'হাঁচি-টিকটিকির বাধা'কে মেনে চলত, যাত্রাপথে শূন্যকলসদর্শন এরা অমঙ্গলসূচক বলে মনে করত, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে মুসলমান আক্রমণের সময় যখন ভারতে একটা অরাজকতা দেখা দেয় তখনই এই ঠগদের সংখ্যা খুব বেড়ে ওঠে। এটা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। এদের মধ্যে সর্বশ্রেণীর লোকই থাকত। দলের ব্রাহ্মণরা গ্রহণ করত খড়্গপুজার ভার এবং ধর্মের দিক দিয়ে বা কুসংস্কারের দিক দিয়ে যা কিছু বিধান সেগুলি তারাই দিত। পরবর্তী যুগে কিছুসংখ্যক মুসলমানও এসে এই ঠগদের দলে যোগ দেয়। তারাও সম্ভবত তাদের নিজেদের বিধি অনুসারে পুজা করত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দুদের পুজাতেও যোগ দিত। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে উগ্র বিভেদ সৃষ্টি হবার আগে অবধি দেখা গেছে যে মুসলমানরা হিন্দুদের উৎসবাদিতে যোগদান করছে এবং হিন্দুরাও ভক্তিভরে পীরের কাছে গিয়ে সিন্নি মানছে। আজ এগুলো ইতিহাসের গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে মিলে পুজা করে ঠগদলের মধ্যে বাস করতে একটুও দ্বিধাবোধ করত না।

ইংলণ্ডের East India Company এদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার পর ইংরাজ শাসকগণ অনেক কুসংস্কারেরই উৎপাটন করেছেন। এই ডাকাত-দলের উৎপাটনেও তাঁরাই অগ্রণী হন। ইউরোপে এই ঠগদের কথা প্রথম গোচরীভূত করেন ফরাসী পর্যটক Tavernier। ইংরাজরাও এদের গল্প এদেশে আসবার আগেই শুনেছিলেন, কিন্তু প্রথম দিকে তাঁরা এ বিষয়ে আদৌ অগ্রণী হন নি। ১৭৯৯ অব্দে প্রথম যখন তাঁরা মহীশূর দখল করেন তখন তাঁদের হাতে এইরকম শতাধিক ঠগ বন্দী হয়। তারপর তাঁরা দেখেন যে তাদের দল ভারতের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বা জমিদাররা এদের কাছ থেকে বৃত্তি পাবার লোভে কোনরকম সাজার ব্যবস্থাও করেনই না, বরঞ্চ এদের রক্ষা করে চলেন। Colonel Sleemanএর উপর ভার পড়ে এদের দমন করার এবং এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেন দেশের বিভিন্ন ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটরা। Sleeman এদের সম্বন্ধে যে বর্ণনা রেখে গেছেন তা থেকে আমরা অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। তিনি

তাঁর গ্রন্থে লিখে গেছেন, এই ঠগরা বিশ্বাস করে যে সত্যই দেবী তাদের এই কার্যের জন্য জগতে পাঠিয়েছেন এবং যতক্ষণ তারা তাঁকে খুশি রাখতে পারবে ততক্ষণ কোন শক্তি তাদের কিছুই করতে পারবে না। এমন কোন রাজশক্তি নেই যা তাদের সাজা দিতে পারে। এই কারণে তারা যখন হত্যা করত আততায়ীর প্রতি তাদের কোনরকম মায়া জাগত না। তারা বিশ্বাস করত যে আততায়ীকে তারা দেবীর উদ্দেশে বলি দিচ্ছে, সুতরাং তার আত্মার সদ্গতি হবে। Thornton তাঁর Illustrations of the History and Practices of the Thugs শীর্ষক গ্রন্থে এদের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখেছেন। তাহলেও অনেক নূতন তথ্য এখনও সংগ্রহ করা যেতে পারে যদি কোন ঐতিহাসিক দিল্লীতে National Archives অফিসে Records-গুলি দেখেন। আশা করি, ভবিষ্যতের কোন তরুণ ঐতিহাসিক এইদিকে দৃষ্টি দেবেন।

বাংলাদেশে ডাকাতরা কালীপুজা করে ডাকাতি করতে যেত। এরা ঠগদের থেকে একটু ভিন্ন রকমের। বোদে ডাকাত এবং বিশে ডাকাতের গল্প আমাদের ছেলেবেলায় দিদিমা এবং ঠাকুমাদের মুখে প্রায়ই শোনা যেত। তারা একবারে লোক খারাপ ছিল না। কালীর ভক্ত, ধনীদের বিত্ত এরা হরণ করত কিন্তু গরীবকে আবার সেই অর্থ তারা দান করত, অর্থাৎ অভিশপ্ত চম্বলের সেই মানসিংহের গল্প। বিহারের ডাকাতরা সুরয দেবতা বা সূর্য-দেবের পুজা করত। এদেরও সেই একই পদ্ধতি, একই মান, একই রক্ত-পিপাসা এবং একই বদান্যতা। এইসব ডাকাতরা নাকি ধনীদের বাড়ীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দাবী করে আগে একটা চিঠি দিত, সে অর্থ পেলে তারা আর ডাকাতি করত না, না পেলে চলত আক্রমণের পালা। এইসব কিম্বদন্তীর পিছনে অবশ্য কতটা ঐতিহাসিক সত্য আছে তা এখন নির্ণয় করা হয়ত কঠিন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে criminal tribeদের কথা। এরা হিন্দুসমাজের অন্তর্গত এবং হিন্দুজাতি বলেই খ্যাত। এদের criminal tribe বলা হয় এই কারণে যে অপরাধ করা এদের ধর্মের একটা অঙ্গ এবং এ অপরাধ না করলে তাদের ধর্মের চোখে অপরাধী এবং সমাজের চোখে হেয় হতে হয়। এটি একটি ভারি অদ্ভুত সমাজবিন্যাস এবং নৈতিক মানদণ্ডে এদের পরিমাপও কঠিন। কারণ নৈতিক দিক দিয়ে শুদ্ধ থাকতে হলে, এরা

হয় ধর্মের কাছে অপরাধী, আর সমাজে স্থান পেতে হলে এরা হবে নৈতিক দিক দিয়ে অশুদ্ধ। ইংরাজশাসন আমলে তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছিল criminal tribe; অবশ্য criminal তারা আমাদের চোখে, নিজেদের ধর্মের এবং সমাজের চোখে নয়।

উপরের আলোচনা থেকে একটা জিনিস স্বভাবতই প্রতীয়মান হয়। জগতে absolute ethical principle বলে কোনও জিনিষই নেই। সেই জন্য আমরা যেটাকে বলি কুসংস্কার, অন্যের চোখে সেইটাই ধর্ম। আমাদের কাছে যেটা নীতিবিরুদ্ধ, অপরের কাছে হয়ত সেটা মোটেই গর্হিত নয়। নরহত্যার চেয়ে নীতিবিরুদ্ধ কাজ জগতে নিশ্চয়ই কিছু নেই, অবশ্য সেটা আমাদের চোখে। কিন্তু জগতে এমন জাতি বা উপজাতি অনেক আছে যাদের কাছে নরহত্যা মোটেই গর্হিত কাজ নয়। আফ্রিকার cannibalদের কথা ধরা যাক। তাদের সমাজ ও ধর্ম এটাকে অনুমোদনের ছাপ দিয়ে দিয়েছে। ভারতের Criminal tribeদের বেলাও সেইরকম। Criminal তারা আমাদের চোখে, তাদের সমাজের বা ধর্মের চোখে নয়।

ভারতের বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে আলোচনার সময় J. N. Farquhar এদের একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন:

"The phrase Criminal Tribes is used strictly of tribes whose regular caste-occupation is some form of crime. The form of crime which a tribe practises is part of the caste-organisation, and is carried on under very strict rules. Thus among the Ghantichors of the Bombay Presidency it used to be the rule that a youngman could not marry until he had stolen a nose-ring off a woman's face. The same tribe is bound by another rule, that they must steal only by day until quite recently; if a man stole by night, he was outcasted. The reason why these regulations are so well understood and so carefully observed is that they are to the tribesmen religious laws. In most cases the tribe holds that the gods have imposed their particular crime-occupation on them; that, so long they follow it in accordance with caste rules, they are true men and faithful to their religion, and that, if they were to give it up, the gods would wreak their displeasure on them. Hence, before starting out on a criminal expedition, they offer prayers to

their divinity, and when they return, they dedicate to him a percentage of their spoils. The Chhapparbands of the Bombay Presidency, for example, when caste profession is the making of counterfeit coins, give 12½ percent." Modern Religious Movements in India, 1918. (পৃঃ ৪২৪-৪২৫)

এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্বভাবতই মনে জাগে। হিন্দুসমাজকে আমরা বলি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তা যদি হয় এরা এই চতুর্বর্ণাশ্রমধর্মের মধ্যে স্থান পেল কিভাবে? এখানে বর্ণাশ্রমধর্মের প্রকৃত রূপটা একটু আলোচনা করা দরকার। বর্ণ শব্দটি এখানে অদ্ভুত অর্থজ্ঞাপক এবং একে বুঝতে হবে জাতিপদ থেকে একটু পৃথক করে। 'জাতি' কথাটি জন্ ধাতু থেকে উদ্ভূত; অর্থাৎ জাতি হল জন্মগত। কিন্তু 'বর্ণ' জন্মগত নয়, এটি গুণ এবং কর্মের দ্যোতক। সুতরাং জাতি অপরিবর্তনীয়, কিন্তু গুণ ও কর্ম অনুসারে মানুষের বর্ণের পরিবর্তন ঘটতে পারে। বর্ণকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে 'পুরুষসূক্তে' আমরা এই চার বর্ণের একটি সুন্দর বিবরণী পাই। বলা হয়েছে যে পুরুষের মস্তক থেকে ব্রাহ্মণের, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়ের, উরু থেকে বৈশ্যের এবং পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তি। এটি একটি রূপক বর্ণনা। ব্রাহ্মণের পেশা মস্তিষ্ককে কেন্দ্র করে, বাহুকে কেন্দ্র করে ক্ষত্রিয়ের; উরু দেহকে ধারণ করে, সুতরাং সমাজ ধারণের জন্য যা প্রয়োজন, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি তাকে কেন্দ্র করে বৈশ্যের পেশা; পাদদ্বয় সর্বনিম্নে আমাদের দেহের সেবা করে, তাই অন্য জাতিদের সেবা করাই শূদ্রের কাজ। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এই যে বর্ণবিভাগ এটি বৃত্তিকে কেন্দ্র করে। বৃত্তি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন:

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ (৪, ১৩)

মহাভারতের মধ্যেও ঠিক ঐ একই ধরনের কথা বলা হয়েছে:

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব হি কারণম্॥ (১৩, ১৪৩, ৫০)

ব্রহ্মপুরাণেরও ঐ মত:

এভিস্তু কর্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং গচ্ছেৎ বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥' (২৩, ৩২)

শাস্ত্রকারদের এইসব উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ভারতীয় বর্ণ-বিভাগের মূলে জন্মের কোন প্রভাবই ছিল না। সেটা ছিল জাতিবিভাগের মূলে। চারি বর্ণে ভারতবাসী বিভক্ত, আর প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের জাতি। এই হচ্ছে প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ছবি। গোঁড়া ধর্ম-শাস্ত্রকাররা এটাকে খানিকটা বিকৃত করার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁরা বর্ণকেও জন্মের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রগুলি পাঠ করলেই এর উল্টো ছবিটা আমরা পাই। মনুর দশম অধ্যায়ের বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন মনীষী দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন উপজাতি ও আদিবাসীর দল হিন্দুসমাজের মধ্যে তাদের স্থান করে নিয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে বর্ণপ্রথার প্রভাবেই। এরা দ্বিজদের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছে এবং দ্বিজরাও এদের নিজেদের সামাজিক এবং ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। হিন্দুধর্মের এটা উদারতা ও মহত্ত্ব বলে স্বীকার করে নিতেই হবে। আর এই উদারতার জন্যই এ সমাজ শতসহস্র বাধাবিপত্তি সহ্য করে আজও টিঁকে আছে।

তথাকথিত Criminal tribeরা যখন হিন্দুসমাজের মধ্যে স্থান লাভ করল, তারা তাদের ভাবধারা সবই বজায় রাখবার স্বাধীনতা পেল। তাদের কাজকর্ম সমাজের চোখে দোষের বলে প্রতীয়মান হল না। সমাজ কিন্তু রাজশক্তির দিকে চেয়ে রইল এদের দমন করার জন্য। অর্থাৎ এদের ধর্মটা অসামাজিক নয়, অসামাজিক এবং গর্হিত হল কাজটা।

হিন্দুসমাজের একটা গলতি কিন্তু হয়েছে এবং তার জন্য একে প্রায়শ্চিত্তও করতে হচ্ছে। সমাজ এদের সংশোধনের কোনও চেষ্টাই করে নি। সে ভার নিল খ্রীস্টধর্ম প্রচারকরা, রাজশক্তির সহায়তায়। ফলে এরা দলে দলে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছে যা আজ একটা বিরাট সমস্যায় পরিণত হয়েছে। কারণ এই প্রচারকরা অনেক সময়েই এদের রাজনীতির ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করেন। দেশের জীবন আজ তাই জটিলতায় পূর্ণ হচ্ছে। ধর্মের মধ্যে কুসংস্কার ঢুকলে সুদূর ভবিষ্যতে তার কি পরিণাম হতে পারে এইটাই তার জাজ্বল্য প্রমাণ।

ধারণবিধি (ক)

যদি কেউ কবচ অথবা তাবিজ ধারণ করেন, আধুনিক শিক্ষিতরা একটু মুচকে হেসে বলবেন, লোকটা একেবারেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। লোকটা যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যিনি আজ মুচকে হাসলেন, তিনিই তিনদিন পরে হঠাৎ একটা বড় মাদুলি গলায় বা হাতে ধারণ করবেন, ভাগ্যোন্নতির অথবা অজানা ভয় নিবারণের আশায়। এদিক দিয়ে যতই আমরা সংস্কারমুক্ত হবার বড়াই করি, সব দেশে এবং যুগে এই সংস্কার একটা মস্ত ভূমিকা গ্রহণ করে আছে মানুষের জীবনে। এই কুসংস্কারকে কেন্দ্র করে একটা বড় ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন আমাদের জ্যোতিষীরা এবং এঁদের কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করেন শিক্ষিতেরাই বেশি, যাঁরা নিজেদের উদারপন্থী বলে জাহির করতে চান। এই উদারপন্থীরা প্রায়ই গোপনে যান, পাছে তাঁদের কুসংস্কারটা বেরিয়ে পড়ে। ঠাকুরমশায় মাদুলী দেন, বলেন দক্ষিণ হস্তে বা গলায় অমুক বারে ধারণ করবেন। জানাজানি হবার ভয়ে উদারপন্থী নিবেদন করেন কোমরে ধারণ করলে চলবে কিনা। ঠাকুরমশায় 'না' বললে ধারণ করেন এমনভাবে, গলার কলারটাকে উঁচু করে অথবা গেঞ্জির তলায়, যাতে দেখা না যায়।

কিন্তু এত লুকোচুরি কেন, এর সাক্ষ্য রয়েছে সব জাতির ইতিহাসেই। এ ইতিহাস পরে আলোচনা করব, আগে আমাদের সমাজের কথাটাই বলে নিই। আমাদের সমাজে এটা আজ চলছে দুটি বিভিন্ন স্তরকে কেন্দ্র করে, *একটি জ্যোতিষ আর একটি হল লোকাচার।* বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত ও উদারপন্থীরা বাস করেন নিঃসন্দেহে কলিকাতা নগরীতে এবং এখানে জ্যোতিষীর সংখ্যা কত নির্ণয় করা কঠিন। বড় রাস্তায়, গলিতে সর্বত্র সাইনবোর্ড, এঁদের কাছে আসুন ভাগ্য আপনার মুঠোর মধ্যে, প্রয়োজন কেবল একটা কাচের বা একটা রত্নের। শুভ দিনক্ষণ দেখে ধারণ করে নিন, সম্রাট না হতে পারেন, সামন্ত নিশ্চয় হবেন। এঁদের কাছে দলে দলে ছুটছেন অধ্যাপক, উকিল, ব্যারিস্টার, চিকিৎসক, ব্যবসায়ীর

দল, কিসে ভাগ্যোন্নতি হবে তারই আশায়। কেউ মুখে স্বীকার করেন, কেউ করেন না।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। শাস্ত্রকাররা খাঁটি মনেই তাঁদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে শাস্ত্র রচনা করেন। এটাকে empirical scienceএর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, অনেকটা ডাক্তারি বিদ্যার মত। যাঁরা Allan Leoর How to Judge a Nativity প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করেছেন, তাঁরা এটার প্রতি খানিকটা আস্থাবান হবেন। আমাদের বৃহৎ পারাশরীয় হোরাশাস্ত্রম্, ভৃগুসূত্র প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করলে অবশ্যই মনে হবে জ্যোতিষকে আমরা যতটা উপহাস করি এটা ততটা উপহাসের বস্তু নয়। আপত্তি তখনই যখন এটাকে ধর্মের মাধ্যমে এনে একটা চাওয়া-পাওয়ার যন্ত্রে পরিণত করা হয় এবং বিধান দেওয়া হয় গ্রহশান্তি ইত্যাদির। আচ্ছা, একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, তাহলেই বোঝা যাবে কতটা কুসংস্কার এবং অজ্ঞান এটাকে অপ্রিয় করেছে। একদল জ্যোতিষী বলেন যে যদি বৃহস্পতিগ্রহ বিরুদ্ধ হয়, তাহলে 'গুরৌ মুক্তাং' ইত্যাদি বচন অনুসারে একটা মুক্তা ধারণ করলেই আপনার বৃহস্পতিগ্রহ আর খারাপ ফল দিতে পারবেন না। আর একদল বলেন মুক্তা নয় হলদে পোখরাজ ধারণ করা উচিত। কি ধারণ করা উচিত আর তার কি ফল হয়, ঠাকুরমশায় নিজেই তা জানেন না; তবে তিনি জানেন কোন ফিকিরে তাঁর পকেট স্ফীত হবে। আর উদারপন্থী শিক্ষিতের দল তাঁরই পিছনে ছুটেছেন ভাগ্যোন্নতির আশায়।

প্রথমেই বলেছি যে জ্যোতিষশাস্ত্র যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা স্বীকার করবেন এটি empirical scienceএর অন্তর্গত। কিন্তু এই শাস্ত্রকে অন্য এক ধাপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে প্রত্যেক গ্রহের একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন এবং একজন অধিদেবতা, প্রত্যধিদেবতা ইত্যাদি। গ্রহকে তুষ্ট করতে হলে অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দেবতা, অধিদেবতা সকলের পুজা করতে হবে এবং গ্রহবিপ্রকে যথোচিত দক্ষিণা দান করে তারপর রত্ন ধারণ করতে হবে, নচেৎ কোন ফল হবে না। সহজেই বোঝা যায় যে ধর্মের আবরণে এ শাস্ত্রকে ঢেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সংস্কারের পর্যায়ে। মুস্কিল বাধল বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে, কারণ তাঁরা এই অধিষ্ঠাত্রী দেবী পুজা করতে প্রস্তুত নন। সঙ্গে সঙ্গে বিধান এল প্রত্যেক গ্রহের এক একজন অবতারও আছেন, তাঁর পুজা করলেও চলবে।

জ্যোতিষ ঠাকুরের পাল্লায় পড়লে আর রক্ষা নেই, যে উপায়ে হোক ধারণ করতেই হবে, আর চাই মোটা দক্ষিণা।

পরাশর অবশ্য নিজেই বলেছেন—

'ক্রুরগ্রহদশাকালে শান্তিং কুর্যাৎ বিচক্ষণঃ' (৪৯, ১৬৮)

কিন্তু তাঁর এই গ্রহশান্তি বেশির ভাগ হল জপের বিধান। বিভিন্ন গ্রহদশাভোগকালে তিনি বিভিন্ন জপের বিধান দিয়েছেন। সংযমী হয়ে শুদ্ধচিত্তে জপ করলে ভগবানের কৃপালাভ করা যায় এবং ভগবৎকৃপায় সব অশুভই শুভ হয়। যদিও এখানে বলতে হবে, এ উপাসনাও ভোগের উদ্দেশ্যে, চাওয়া-পাওয়ার গণ্ডীর ভিতর এ সীমাবদ্ধ। গীতার মধ্যে শ্রীভগবান যে দ্বিতীয় শ্রেণীর ধর্মের কথা বলেছেন এটা সেই ধর্ম; খানিকটা কুসংস্কার মাখান, প্রথম শ্রেণীর ধর্ম এটা নয়।

প্রত্যেক গ্রহের জন্য এক একটি কবচের ব্যবস্থাও আছে। এই কবচগুলি গ্রহযামল এবং শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের অন্তর্গত। দুটিই অর্বাচীন গ্রন্থ, মধ্যযুগে লেখা। এই কবচ পাঠ বা ধারণে ফল হয় কিনা জানি না, তবে ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে এর মধ্যে অনেক নূতন তথ্য মেলে। যেমন ধরুন শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের চন্দ্রকবচে আছে—

সোমবারে মহেশানি কুম্ভোপবসনং মুদা।
সায়ং সোমং সমভ্যর্চ্য কবচং দ্বি পঠেৎ যদি।
মাসমধ্যে মহেশানি পুত্রবান্ স ভবেৎ ধ্রুবম্ ॥

এখানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সোমদেবের কৃপায় মানুষ পুত্রবান হয়। এর প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হয় যদি আমরা আদিমজাতির বিশ্বাসের দিকে লক্ষ্য করি। অনেক আদিমজাতির মধ্যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে স্ত্রীলোকের সন্তান লাভের জন্য পুরুষসংসর্গের প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোক যদি বেশিক্ষণ চাঁদের দিকে চেয়ে থাকে, তাহলে সে গর্ভবতী হয়। এই আদিম বিশ্বাসের প্রভাব আমরা প্রকৃষ্টভাবে লক্ষ্য করি শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের লেখকের উপর। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে আদিমবাসীর আর একটি বিশ্বাসের। তাদের মধ্যে এ বিশ্বাসও ছিল যে নারীর গায়ের ঘাম গায়ে শুকিয়ে গেলে ঐ ঘাম থেকে সে গর্ভবতী হয়। আমরা যে কার্তিকের উপাখ্যান পাই, তার মূলে এই বিশ্বাস কাজ করছে। পার্বতী একদিন তাঁর গায়ের ঘাম এবং ময়লা শরবনে নিক্ষেপ করেন এবং তাই

থেকেই কার্তিকের জন্ম। পুরুষের সাহচর্য বিনা নারীর সন্তান হতে পারে, এ বিশ্বাস আদি যুগে ভূমধ্যসাগরবাসীদের মধ্যেও ছিল। তাই মেরী সন্তানবতী হয়েও কুমারী।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সম্ভবত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে কবচ ইত্যাদি ধারণের খানিকটা ব্যবস্থা আদিমজাতির চিন্তাধারা থেকেই আর্যসমাজে এসেছিল। 'মণি' ধারণে ফলের উল্লেখ আমরা সর্বপ্রথম পাই ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে (১, ৩৩, ৮) এবং বোধ হয় ঋগ্বেদের আর কোথাও 'মণি' ধারণের উল্লেখ নেই। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে ঋগ্বেদের প্রথম এবং দশম মণ্ডল অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগে লেখা যখন আর্যরা বেশ খানিকটা আদিবাসীর সংস্পর্শে এসে গেছে। তা যদি মানতে হয়, তাহলে হয়ত এ সিদ্ধান্ত অন্যায় হবে না যে 'মণি' ধারণ প্রথা হয়ত আর্যেতর জাতির দান। এরপর মণি এবং কবচ এ দুইয়েরই বিশদ ব্যবস্থা অথর্ববেদের মধ্যে। অথর্ববেদকে গোঁড়ারা বেদ বলেই স্বীকার করতেন না, কারণ এর মধ্যে বহুল অনার্যপ্রভাব বিদ্যমান। এই বেদের অনেক মন্ত্রেই আমরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকারেরর কবচ ধারণের বিবরণ পাই। শুধু কবচ নয়, বিভিন্ন ধাতু, গাছের টুকরা প্রভৃতি শরীরে ধারণ করার বিবরণ এই বেদের মধ্যে পাওয়া যায়। এ সব ধাতু বা গাছের টুকরা ধারণ করবার আগে ক্রিয়াকর্মের বিধান আছে। এই সব ক্রিয়াকর্মের পর ধারণীয় বস্তুটি সঙ্কুচিত হয়, বিশ্বাস করা হয় এর মধ্যে একটি দৈবশক্তির অধিষ্ঠান হয়েছে এবং তখন শুভলগ্নে, সংযমী অবস্থায় ধারণ বিধেয়।

আমরা যদি এই বিষয়টা বিশ্লেষণ করি তাহলে এর মধ্যে দুটি জিনিস আমরা দেখতে পাব। প্রথমে দ্রব্য এবং তারপর দৈবশক্তি। এ দুটির সমন্বয় হলেই তবে ধারণে ফল হবে। বিভিন্ন দ্রব্যশক্তিতে বিশ্বাস অথর্ববেদের মধ্যে খুব বেশি দেখা যায়। এক একটি দ্রব্যের এক একটি গুণ, এবং এক এক উদ্দেশ্যে তা ফলপ্রদ। যা আমার শরীরকে রোগমুক্ত করবে তার হয়ত আবার শত্রুনাশ করার ক্ষমতা নেই। আবার যা দিয়ে আমার শত্রুনাশ করা যাবে, তা দিয়ে আমার হয়ত অর্থলাভ হবে না। বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন গুণ এবং এই দ্রব্যটি ঠিকমত বেছে নিয়ে কাজে লাগাবার প্রয়োজন। এখানে যদি ভুল হয়, অর্থাৎ যে দ্রব্যের যে কার্যকারিতা তাকে যদি অন্য বিষয়ে ব্যবহার করা হয় তাহলে সে ধারণে কোনই ফল নেই।

দ্রব্যশক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন ঐশীশক্তির। ঐশীশক্তি ব্যতীত আবার ধারণীয় দ্রব্যের কোন সার্থকতাই নাই। বিশ্বাস করা হত যে যখন ঐ দ্রব্যের মধ্যে ঐশীশক্তির সমাবেশ হয় তখন তা থেকে এমন একটা বিশেষ শক্তি বিচ্ছুরিত হয় যা ধারণকারীকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করে। কোন কোন সূক্তে অবশ্য আমরা দেখতে পাই যে একটি কবচ ধারণ করে মানুষ বিভিন্ন বিপদ থেকে মুক্তির আশা করছে। প্রত্যেক বিপদের জন্যই আর আলাদা করে কবচ ধারণের প্রয়োজন নেই, ঐ একটি কবচেরই বহুধা শক্তি।

এর মধ্যে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। সেটি হল যে দ্রব্যশক্তি ঐশীশক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে মানুষের দেহের সংস্পর্শে এসে আর একটি নূতন শক্তির সৃষ্টি করে। যতক্ষণ না এই শক্তির সৃষ্টি হচ্ছে ততক্ষণ এর কার্যকারিতা প্রকাশ পায় না। সুতরাং পরোক্ষভাবে এটা এখানে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যে মনুষ্যদেহের মধ্যেও একটা শক্তি কাজ করছে। তাই এই শক্তির পূর্ণবিকাশের জন্য চাই সাধনা এবং সংযম। বোধ হয় এই থেকেই পরবর্তীযুগে তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে পাত্রাপাত্রভেদের কল্পনা এসেছে। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই—এর প্রকৃত অর্থ যদি মেনে নিতে হয় তাহলে মানুষের দেহের মধ্যে যে একটা বিরাট শক্তি লুকিয়ে আছে, যেটাকে জাগিয়ে তুলতে পারলে ঐশীশক্তির পর্যায়ে গিয়ে পৌছতে পারে কবচধারণের মূলে এ তত্ত্ব খানিকটা সক্রিয়। তাই পরবর্তীযুগে বারবার এ কথাটা জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে কবচধারণকারীর নিজের গুণের উপরই তার ফলাফল নির্ভর করে।

তাহলে ধারণবিধির মূলে আমরা একটা দার্শনিক তত্ত্ব, লৌকিক ধর্ম এবং কুসংস্কার এই তিনটি জিনিসের সমন্বয় দেখতে পাই। Frazer প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা এই ধারণবিধিকে magic এবং religionএর সংমিশ্রণ বলে বর্ণনা করেছেন। এখন এটাকে যদি magic বলেই ধরা হয় তাহলেও বুঝতে হবে যে এর মধ্যে খানিকটা শক্তি লুকিয়ে আছে। Magic যাঁরা দেখান তাঁরা নিশ্চয়ই খানিকটা যাদুবিদ্যা জানেন বৈকি। আর এই বিদ্যাটাকে সম্পূর্ণ কুসংস্কার বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু ধারণের মূলে খানিকটা কুসংস্কারের ছোঁয়াচ আছে। কাজেই এটাকে magic এবং religionএর সংমিশ্রণ না বলে superstition এবং religionএর সংমিশ্রণ বলাই ভাল।

গবেষণা ছেড়ে এখন আমরা একটু বৈদিক সাহিত্যের দিকেই ফিরে

তাকাই। কৌশিকসূত্র, ৭, ১৫-২১ পাঠে আমরা জানতে পারি কিভাবে একটি কবচ ধারণ করবার পূর্বে তাকে দধি এবং মধুর মধ্যে আগে তিনদিন ডুবিয়ে রাখা হত। তারপর তাকে ডুবিয়ে রাখা হত ঘি-এর ভিতরে। শেষে ঘি থেকে তুলে নিয়ে পুরোহিত এর পুজা আরম্ভ করতেন এবং ধারণেচ্ছু একগুচ্ছ দুর্বা নিয়ে পুরোহিতের পিছনে দাঁড়িয়ে পুরোহিতকে স্পর্শ করে থাকতেন। যথারীতি পূজা এবং যজ্ঞের শেষে পুরোহিত কবচ যজমানের কণ্ঠে বা হাতে বেঁধে দিতেন। প্রাচীন ভারতীয় পুস্তকগুলি যদি আমরা দেখি তাহলে এইটাই প্রতীয়মান হয় যে ধারণের সামগ্রী বেশির ভাগই যোগাড় করা হত ভেষজ সামগ্রীর মারফত ; যেমন, দীর্ঘজীবন কামনায় সরল গাছ, ধান বা যব এইসবের শাস্ত্রীয় ব্যবহারের বিধি দেখা যায়, বালকদের কৃমি প্রভৃতি অসুখের জন্য দুর্বামূল ধারণের ব্যবস্থা। বিভিন্ন রোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হত মুঞ্জগাছের শীষ দিয়ে, জঙ্গিরবৃক্ষের (Terminalia Arjuna) মূল ধারণ করা হত ভূত তাড়াবার জন্য। স্বামীকে বশীভূত করবার জন্য দর্ভের আংটি করে মেয়েরা আঙুলে ধারণ করত। বিভিন্ন প্রাণীর চর্ম ইত্যাদিও ব্যবহার করা হত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হত কৃষ্ণমৃগের লাঙুলের চুলগুলি। অনেক তুকতাক চলত এই জিনিস দিয়ে। অথর্ববেদের মধ্যে মণিমুক্তা বা ধাতু ধারণের উল্লেখ খুব বেশি করা হয় নি। এক জায়গায় আমরা ত্রিলৌহের ব্যবহার দেখতে পাই। এ ত্রিলৌহ হল সোনা, রূপা এবং তামা। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারের মধ্যেও এই ত্রিলৌহমুদ্রার রোগবিনাশনের কথা বলা হয়েছে। (ইয়ং ত্রিলৌহমুদ্রা সর্ব-রোগবিনাশিনী ইত্যাদি)

উদাহরণ বাড়িয়ে আর লাভ নেই। এইটুকু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে বিভিন্ন দ্রব্য ব্যবহার করা হত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে। অনেকে হয়ত এই ধারণ-বিধিটাকে কুসংস্কার বলতে চাইবেন না। তাঁরা বলবেন যে প্রকৃত সাধক যদি এইসব প্রক্রিয়ার মারফত ধারণের ব্যবস্থা দেন, ফল নিশ্চয়ই হয়। সাধক সত্যই জগতে অনেক কিছু করতে পারেন। তাঁদের আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করি। তাঁদের অলৌকিক শক্তিতে সবই সম্ভব। কিন্তু তাহলে বিষয়টা দাঁড়ায় এই যে, ধারণের যে ফল সেটা মুখ্যত হয় সাধকের শক্তির দ্বারা এবং গৌণত ধারণীয় দ্রব্য মারফত। কিন্তু সত্য সাধক আজ আমরা কোথায় পাব ? তাঁদের সাক্ষাৎ পাওয়া আজ একটা সমস্যা। অন্যদিকে যে কোন

একটি পত্রিকা নিয়ে তার বিজ্ঞাপনের পাতাগুলি খুলে দেখুন, আপনার অভীষ্ট সব কিছুই সেখানে পাবেন, যেমন শনিকবচ ধারণে কার্যসিদ্ধি, সৌভাগ্যবৃদ্ধি, সম্মানলাভ ইত্যাদি ইত্যাদি। এর যেটি প্রধান অংশ সেটি হল, মূল্য—সাধারণ ৫।৵০ এবং বৃহৎশক্তিসম্পন্ন ৪৫।০। কাজেই সৌভাগ্য এখন আপনার নিজের হাতেই, ঐ টাকাটা পাঠিয়ে দিন। আপনি যাতে আরও মোহিত হন তার জন্য দেওয়া আছে এই কবচের তালিকার তলায় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম যাঁরা সব certificate দিয়েছেন। কারও প্রতি কোন কটাক্ষপাত না করে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যে যাঁরা এই কবচের ব্যবসা করছেন তাঁরা কি সকলেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধক? কিন্তু ব্যবসা ত বেশ চলছে। কাজেই এটাকে একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কি বলবেন, আর এই যে ব্যবসা চলছে এর ভিত্তি কি কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের উপর নয়?

একটি দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যায় প্রায়ই দেখি যে বিভিন্ন জিজ্ঞাসুকে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, অমুক রত্ন ধারণ করুন, অমুক ধাতুর একটি অঙ্গুরীয়ক হাতে লাগান ইত্যাদি ইত্যাদি। কই, বিধানের মধ্যে এ কথা একবারও বলা হয় না যে এগুলি প্রকৃত সাধকের দ্বারা শোধিত হওয়া দরকার, সাধক একে শক্তিসম্পন্ন করে দেবেন নিজের শক্তির দ্বারা, তারপর শুভ দিনক্ষণে পবিত্র দেহে এবং মনে এটি ধারণ করতে হবে। উক্ত পত্রিকার এ বিধানকে কুসংস্কারের অন্তর্গত করা ছাড়া কোন পর্যায়ে ফেলা যায়? শাস্ত্র যদি মানতে হয় সবটাই তার মানতে হবে। যদি ফল হয় তাহলেই হবে। নতুবা হবে সেটি কুসংস্কার মাত্র, যা থেকে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ লোক মুক্ত নন। আর এই কুসংস্কারকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে বেশ একটা ব্যবসা গড়ে উঠেছে। এ ব্যবসা চলেছে মানুষের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে। দুরবস্থা যত বাড়বে এ ব্যবসা তত বেড়ে উঠবে।

নৃতত্ত্ববিদরা ভারতের বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতির মধ্যে যে সব অদ্ভুত ধারণের প্রথা প্রচলিত আছে তার তালিকা সংগ্রহ করেছেন। এ থেকে আমরা মানুষের বিভিন্ন স্তরে বিশ্বাসের একটা নমুনা পাই। কোন কোন ক্ষেত্রে এ বিশ্বাসগুলি এত অদ্ভুত যে আমরা হয়ত সেগুলি জেনে হাসতে আরম্ভ করব এবং খানিকটা বিদ্রূপও করব। কিন্তু যারা এইভাবে ধারণ করছে তাদের কাছে এটা অমূল্য জিনিস এবং এর মূল্যও অনেক। J. M. Campbell তাঁর Notes on the Spirit Basis of Beliefs and Customs এবং

E. Thurston তাঁর Ethnographic Notes in South India গ্রন্থে এই সমস্ত বিশ্বাসের তালিকা সংগ্রহ করেছেন। এ থেকে আমরা দু'একটা উদাহরণ আলোচনা করতে পারি। Campbell দেখিয়েছেন যে আদিম জাতিসমূহের মধ্যে গাছের পাতা, ফুল অথবা ধাতু অথবা বিভিন্ন পাথরের মালা ধারণ করার একটি পদ্ধতি সুপ্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছে। এগুলি শুধু তাদের বেশভূষারই অঙ্গ নয়, এগুলিকে তারা তাদের রক্ষাকবচ হিসাবে ব্যবহার করে। এই আদিম সমাজের ছায়া আমরা দেখতে পাই আধুনিক সমাজেও, যখন দেখি যে শিক্ষিতা মেয়েরাও বিবাহের পর বাম হাতে একটি লোহা ধারণ করেছেন। সিঁদুর ধারণ সধবার লক্ষণ, আর এটা আবার নানা বিচিত্রভাবে ধারণ করে শোভাবর্ধনের কাজও চলে। সধবা মেয়েরা কেন শাঁখা, সিঁদুর ও লোহা ধারণ করেন, তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে হাতে লোহাধারণ স্বামীর দাসত্বের পরিচায়ক। তাঁরা বলেন, এক সময় ছিল যখন সবল পুরুষরা নারীকে ধরে এনে স্ত্রী এবং দাসী দুইভাবেই তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করত। সেই দাসত্বের শৃঙ্খল আজ আর নেই, তার প্রতীক পড়ে আছে লোহায়। আরও অনেক ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিন্তু শাঁখা এবং সিদুরের ব্যাখ্যা কেউই ভালভাবে করতে পারেন নি। লোহার শিকল দিয়ে স্ত্রীকে নামান হত দাসীর পর্যায়ে, কিন্তু শাঁখা এবং সিঁদুরের ব্যবহার সে অর্থে কখনই হতে পারে না। এর মূলে হয়ত ঐ আদিমবাসীদের খানিকটা প্রভাব রয়েছে। তারা বিভিন্ন রঙে দেহকে সজ্জিত করে এবং সেগুলি হল মঙ্গলচিহ্ন; লোহা পরে, শঙ্খ এবং প্রবালের মালা পরে। আর্যরা এই আদিমবাসীদের সংস্পর্শে আসার পর হয়ত এই বেশভূষার প্রথা এবং এর যৌক্তিকতা আর্যনারীরাও গ্রহণ করেছিল। সেই প্রথাই হয়ত চলে আসছে। এর অবশ্য অন্যভাবে আর একটা ব্যাখ্যাও করা যায়। সেটা হচ্ছে জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যাখ্যা। মেয়েদের বৈধব্যযোগের সূচনা করে রবি, মঙ্গল, শনি, রাহু, ক্ষীণ চন্দ্র ইত্যাদি গ্রহ, যদি তারা দুঃস্থানে থাকে। এখন লোহাকে মনে করা হয় শনি এবং রাহুর প্রতিষেধক, লাল রঙ্ রবি এবং মঙ্গলের, আর শঙ্খ চন্দ্রের। হয়ত প্রথমে স্বামীর দীর্ঘজীবন কামনায় জ্যোতিষশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মেয়েরা এগুলি ধারণ করতে আরম্ভ করে। সবগুলি সকলের ধারণের প্রয়োজন নেই, কারণ চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ যদি কোন মেয়ের দুঃস্থানগত না হয়, তাহলে এসব ধারণের প্রয়োজনের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু

কালক্রমে আমরা জ্যোতিষশাস্ত্রের যৌক্তিকতা—তা যতই অকিঞ্চিৎকর এবং অবান্তর হোক—হারিয়ে ফেলি এবং এটা একটা সাধারণ পদ্ধতিতে পরিণত হয়। এইখানেই আমরা পাই কুসংস্কারের সন্ধান, যে কুসংস্কারের মূলে কোন যুক্তি নেই। আজ যদি কোন জ্যোতিষী কোন শিক্ষিতা মহিলাকেও বলেন, আপনার প্রতি শনি রাহু কেউই বিরূপ নন, সুতরাং আপনি আপনার বাঁ হাতের লোহাটা খুলে ফেলতে পারেন,—মহিলাটি নিশ্চয়ই শিউরে উঠবেন এবং কিছুতেই খুলতে রাজী হবেন না। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা যাবে যে তিনি তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে Plato এবং Aristotle নিয়ে আলোচনা করছেন। যাঁরা জিনিসটা মানেন না তাঁদের কথা অবশ্য আলাদা।

বিভিন্ন রত্নের ব্যবহার চলে আসছে সৌভাগ্যলাভের উদ্দেশ্যে। ধাতুর মধ্যে লোহাকে সময়ে সময়ে সৌভাগ্যদায়ক বলে ধরা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে ডোমদের মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে। এরা যখন ডাকাতি করতে যায়, সব সময় হাতে একটা লোহার যন্ত্র থাকে এবং এদের বিশ্বাস লোহার যন্ত্র কাছে না রেখে ডাকাতি করলে তাদের দেহে রোগের সঞ্চার হবে এবং তাদের চোখ নষ্ট হয়ে যাবে। পাঞ্জাবে কারুর সাইটিকা (Sciatica) হলে তাকে তামা ধারণ করতে দেওয়া হয়। অশিক্ষিত পাঞ্জাবীদের মধ্যে বিশ্বাস যে প্রেতের ভরেতেই সাইটিকা হয় এবং তামা ধারণ করলে এ ভর কেটে যায়। আসামের নাগাদের মধ্যেও এইরকম আচারের নমুনা পাওয়া যায়। মাদ্রাজের লোকদের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে যদি কোন শৃগালের মাথায় শিঙ্ দেখা যায় তাহলে ঐ শিঙ্ ধারণ করলে ভাগ্যোন্নতি হয়। আমাদের দেশে ছোট ছেলেদের কোমরে একটি তামার পয়সা কালো সুতা দিয়ে বেঁধে দেওয়ার প্রথা ছিল। এতে ছেলেটির উপর কোন অপদেবতার নজর পড়বে না এবং তার স্বাস্থ্য অটুট থাকবে। গুজরাটে একটি প্রথা,—সেখানে কায়স্থ সমাজের বালকদের একটি রূপার টাকার উপরে সামান্য ভাত এবং একটু দুধ দিয়ে চেটে খাইয়ে দেওয়া হয় সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে বলে। হিমালয় প্রদেশের বৌদ্ধরা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্তি অঙ্কিত মুদ্রা কাছে রেখে দিত; কারণ তারা মনে করত যে এটি মহাদেবীর ছবি, কিন্তু পরে যখন সম্রাট এডওয়ার্ডের টাকা প্রচলিত হল তারা এটি গ্রহণ করতে বা স্পর্শ করতে ইতস্তত করত। তারা ভাবত যে এর উপর লামার শুধু মাথাটা আঁকা রয়েছে। সম্ভবত সপ্তম এডওয়ার্ডের মুকুটবিহীন ছবি এই বিশ্বাসটাকে জাগিয়ে

তুলেছিল। উত্তর ভারতের কোন কোন উপজাতিদের মধ্যে আর একটা অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে। কোন লোক তার প্রথমা স্ত্রী মারা যাবার পর যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তাহলে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছবি ধাতব কোন পদার্থের উপর এঁকে কাছে রাখে এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে বিবাহের সময়ে যত উপহার দেওয়া হয় সবগুলি আগে ঐ ছবিকে উৎসর্গ করতে হয় নতুবা তাদের ধারণা ঐ স্ত্রীর আত্মা লোকটির নব-বিবাহিতা স্ত্রীর অমঙ্গল করবে।

ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে উল্লিখিত কয়েকটি ধারণের ব্যবস্থা আলোচন করে এ প্রবন্ধটি শেষ করব। জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে আমাদের জীবনের সব সুখদুঃখের মূলে রয়েছে গ্রহের প্রভাব। তাই গ্রহকে খুশি করতে পারলে আমাদের জীবনের সব কিছু কাম্যই লাভ হবে। গ্রহতুষ্টির জন্য ব্যবস্থা আছে কবচ, রত্ন, মূল ও ধাতু ধারণের। যেমন কোন লোকের শনি যদি বিরুদ্ধে থাকে তাহলে তাকে ধারণ করতে হবে শনিকবচ অথবা নীলা (আর এক মতে পরশপাথর বা Loadstone), অথবা শ্বেতবেড়েলার মূল অথবা সীসক। এই ধারণের জ্যোতির্বিধান কিন্তু দু'রকমের। বাংলাদেশে সাধারণ জ্যোতিষীরা যে গ্রহটি বিরূপ তার শান্তির জন্য ধারণের ব্যবস্থা দেন। কিন্তু বাংলার বাহিরে অনেক জ্যোতিষী যে গ্রহটি সবচেয়ে ভাল, যে আমার সর্বাপেক্ষা মঙ্গলকারী তার প্রীতির জন্য অর্থাৎ তার শক্তি আরও বাড়াবার জন্য ধারণের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। ব্যবস্থাও ভিন্ন রকমের। বাংলাদেশে বুধের শান্তির ব্যবস্থা পোখরাজে, কিন্তু পশ্চিমী জ্যোতিষীরা বৃহস্পতির শক্তিবৃদ্ধির জন্য দেন পোখরাজের ব্যবস্থা এবং বুধের শক্তিবৃদ্ধির জন্য দেন পান্নার ব্যবস্থা। এইরকম মতভেদ অনেক বিষয়েই রয়েছে। এখন কার ভাগ্য কিসে সুপ্রসন্ন হবে মানুষ কেবল ছুটছে তারই আশায়, কিন্তু সে পথ সে নিজে খুঁজে পাবে কিনা অথবা কেউ সে পথের সন্ধান দিতে পারবে কিনা, তা অনিশ্চিতের অতল তলে। তবু আশা নিয়ে মানুষ ছুটে চলেছে এবং চলবেও। জগৎ যত দিন থাকবে এ ছোটার বিরতি নেই।

উপরের আলোচনা থেকে এইটাই দেখতে পাই যে আমাদের সমাজে ধারণব্যবস্থার প্রধান উৎপত্তিস্থল অথর্ববেদ, যার উপর প্রচুর পরিমাণে অনার্য, বিশেষ করে আদিবাসীদের প্রভাব পড়েছে। আদিবাসীদের কাছ থেকে কতটা ধারণের ব্যবস্থা আমাদের সমাজে এসেছে তা নির্ণয় করা শক্ত তবে যেমন সর্ববিষয়ে আমাদের সংস্কৃতি আর্য এবং অনার্য প্রভাবের সংমিশ্রণ,

তেমনি সম্ভবত হয়েছে ধারণব্যবস্থায়। বৈদিক ধারণব্যবস্থায় একদিকে যেমন দ্রব্যগুণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে—যা বোধহয় আমরা অস্বীকার করতে পারি না—তেমনি জোর দেওয়া হয়েছে ঐশীশক্তির উপর। আজ যে ধারণব্যবস্থা আমাদের সমাজে চলছে, সস্তা দরে ভাগ্যের টিকিট বিক্রির মত, এগুলি কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। হয়ত এর মূলে একটা অলৌকিক শক্তি বিরাজ করছে, কিন্তু সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেওয়ার মত সে শক্তিকে হারিয়ে পার্থিব একটা ছোট্ট দ্রব্যের পিছনে ছুটে চলেছি। এইটেই হয়েছে কুসংস্কার। নাস্তিকরা হয়ত অন্য কথা বলবেন। তাঁরা হয়ত অলৌকিক কোন শক্তির অস্তিত্বই স্বীকার করবেন না। যাঁরা আস্তিক তাঁরা বিশ্ববিধাতার করুণায় বিশ্বাস করেন। সেই করুণা যেমন বিরাট জিনিসের মধ্যে প্রতিফলিত তেমনিই প্রতিফলিত সামান্য জিনিসের ভিতরেও। তাঁর কৃপায় সবই সম্ভব। সেটা বাদ দিয়ে ধারণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কুসংস্কারেরই নামান্তর। আজকাল এরকম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ভারতে এবং ভারতের বাইরে অনেক পণ্ডিতই করছেন। যাঁরা বিশ্বাস করেন করুন তবে অন্ধ বিশ্বাসকেই বলা হয় কুসংস্কার।

ধারণবিধি (খ)

পাশ্চাত্য বিদ্বানরা কুসংস্কারের কথা উঠলেই ভারতের দিকে আঙুল দেখান। অর্থাৎ জগতে যত কুসংস্কার তার কেন্দ্র হল ভারত। প্রাচ্যভূখণ্ডে ভারত ছাড়া হয়ত দু'একটা আরও এরকম কুসংস্কারের ডিপো আছে, কিন্তু প্রতীচ্য একেবারে কুসংস্কারমুক্ত! প্রতীচ্যবাসীরা চলেন খাঁটি rationalismএর পথে যেখানে কুসংস্কারের কোনও স্থান নেই! প্রাচ্য দেশের মানুষের তুলনায় পাশ্চাত্যবাসীরা নিশ্চয় অনেক বেশী শিক্ষিত, তাঁরা জ্ঞানের অনেক উচ্চ স্তরে, কিন্তু যখন এই জ্ঞানীদের মধ্যেও আমরা দেখি ধারণবিধির প্রচলন, তখন নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য হব। সত্য কথা বলতে কি যদি আমরা একটু পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব যে ধারণ বিষয়ে এরা আমাদের হার মানায়। কত রকম রত্ন ধাতু ইত্যাদি ধারণের ব্যবস্থা! সবগুলিই আমাদের মত চাওয়া-পাওয়ার মাধ্যম হিসাবে; কিসে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে, কিসে হবে আমার আরও উন্নতি।

ভারতীয় ধারণবিধি পর্যালোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে এটা প্রধানত জ্যোতিষশাস্ত্রকে কেন্দ্র করে বর্তমান। ভারতে এই জ্যোতিষশাস্ত্রের অনেকটা এসেছে পাশ্চাত্য জগত থেকে। নিম্নে উদ্ধৃত 'গার্গী সংহিতা'র কয়েকটি পংক্তি এর সাক্ষ্য দেবে :

> ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
> ঋষিবত্তেঽপি পুজ্যন্তে কিং পুনর্দৈববিদ্দ্বিজঃ ॥

শ্লোকটির মর্মার্থ হল এই :

যবনগণ ম্লেচ্ছ, কিন্তু এই (জ্যোতিষ) শাস্ত্র সম্যক্‌ভাবে তাঁদের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁরাও ঋষিগণের ন্যায় পুজাপ্রাপ্ত হন, সুতরাং ব্রাহ্মণগণ যদি দৈববিদ্ হন, অর্থাৎ এই শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করেন, তাহলে তাঁরা যে পুজনীয় হবেন, এ বিষয়ে আর আশ্চর্য কি?

প্রাচীন ভারতে যবন অর্থে গ্রীকদের বোঝাত। এই গ্রীকদের কাছ থেকেই ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের অনেকটা ধার করা। একটা উদাহরণ

দিলেই বোঝা যাবে। আমাদের শাস্ত্রে সোম অর্থাৎ চন্দ্র পুরুষরূপে কল্পিত এবং তাঁর ২৭ জন স্ত্রী। শুক্র দৈত্যগুরু এবং পুরুষ। গ্রীকশাস্ত্রে কিন্তু Luna এবং Venus দুই স্ত্রীগ্রহ। আর ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে আমরা দেখি চন্দ্র এবং শুক্র স্ত্রীগ্রহ, যদিও অন্যত্র তাঁরা পুরুষ। চন্দ্র এবং শুক্রকে স্ত্রীরূপে কল্পনা ভারতীয় জ্যোতিষে যে যবনদের দান তা অনস্বীকার্য। ভারতীয় জ্যোতিষে আমরা যেমন ধারণবিধি দেখতে পাই, তেমনি দেখতে পাই গ্রীকদের মধ্যে, তবে এ বিষয়ে গ্রীকরা ভারতবাসীকে কতটা প্রভাবিত করেছে, তা গবেষণাসাপেক্ষ। গ্রীক সংস্কৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধানতম উৎসস্বরূপ। Socrates, Aristotle প্রভৃতি মনীষীকে কেন্দ্র করেই পাশ্চাত্যজগতে rationalismএর উদ্ভাবন। কিন্তু প্রদীপের পিছনে যেমন অন্ধকার, এই বিরাট গ্রীক সভ্যতার আর এক দিক তেমনি মোহ এবং কুসংস্কারে ঢাকা। সৌভাগ্যলাভের আশায় গ্রীকরা বিভিন্ন রত্নকে বিভিন্ন আকার দিয়ে অঙ্গে ধারণ করত। এই উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে বিভিন্ন গাছ-গাছড়া, জন্তু-জানোয়ারের ছবি এবং দেবদেবীর ছবি ব্যবহারের প্রচলন ছিল। যেমন, Pliny বলেছেন যে Apionএর মতে Cynocephalia গুল্মের একটি টুকরা অঙ্গে ধারণ করলে ধারক অপরের মারণ-উচাটন প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত হতে পারে। এই একটি কথা আমাদের সামনে আর একটা নূতন ছবি তুলে ধরে, সেটা হল মারণ-উচাটনের ছবি। তাহলে সুসভ্য গ্রীকরা মারণ-উচাটনে বিশ্বাস করত এবং তাদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল এবং বাধ্য হয়েই মানুষকে অন্য দিকে এর প্রতিষেধক ব্যবহার করতে হত। বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি এঁকে ধারণ করা হত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, যেমন Apolloর ছবি ধারণ করা হত যুদ্ধে জেতার জন্য, Erosএর ছবি প্রেমিকার মনোহরণের জন্য ইত্যাদি। এখানে ধর্মকে প্রকৃতপক্ষে নামান হয়েছে চাওয়াপাওয়ার পর্যায়ে। আমাদের দেশে যে কবচ ধারণ করা হয় তার সঙ্গে এ প্রথার একটু প্রভেদ আছে। কবচে দেবতার ছবি আঁকা থাকে না, থাকে মন্ত্র লেখা যাতে দেবতার কৃপা ভিক্ষা করা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে— তিনি মস্তক থেকে আরম্ভ করে আমার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্ষা করুন, আমায় বিপদ থেকে মুক্ত করুন অথবা আমার অন্যান্য অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। অনেক সময় মন্ত্রের বদলে কবচে আঁকা থাকে যন্ত্র, যে যন্ত্রকে মনে করা হয় দেবতার প্রতীক। এই কবচের মধ্যে, তা সে মন্ত্রই হোক বা যন্ত্রই হোক,

দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাতে দেবতার পুজা হয় এবং পরে শুভ তিথিক্ষণে এটিকে ধারণ করা হয়। এটা সম্পূর্ণই দেবতার কৃপা-ভিক্ষা, দেবতার কৃপাকে জোর করে টেনে আনার কোনও mechanical process নয়। পাশ্চাত্য জগতের কবজ-তাবিজের সঙ্গে আমাদের প্রথার এই প্রভেদ। যাই হোক, প্রাচীন গ্রীসের ধারণ প্রথাকে কেন্দ্র করে খুব বেশী গবেষণা হয় নি। কয়েকজন জার্মান পণ্ডিত এ নিয়ে কিছু কাজ করেছেন; তবে সে বিষয়ে আলোচনা করবার মত শক্তি যাঁরা জার্মান জানেন না, তাঁদের নেই। তাঁদের কাজের গুণাগুণ বিচার করা অন্তত আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

গ্রীসের বিষয় বলতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে রোমের কথা মনে আসে। সুসভ্য রোমদেশেও নানা রকমের ধারণবিধি প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ে আমরা Plinyর Natural History, Marcellus Empiricusএর চিকিৎসা গ্রন্থ এবং Augustus এবং তাঁর পরবর্তী যুগের কবিদের লেখার মধ্যে উল্লেখ পাই। রোমকজাতির বিশ্বাস ছিল যে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন শক্তি নিহিত আছে। এই শক্তিগুলিকে কাজে লাগাতে হলে বিভিন্ন magical প্রক্রিয়ার প্রয়োজন এবং এই সব প্রক্রিয়া মারফৎ শক্তিভূত করে যদি বিভিন্ন বস্তু অঙ্গে ধারণ করা যায়, তাতে অলৌকিক ফল ফলতে পারে। এটা আমাদের দেশের অনেকটা রত্নশোধন প্রক্রিয়ার মত। যেমন বিশ্বাস করা হয় যে প্রবাল ধারণে মঙ্গলগ্রহ তুষ্ট হন এবং ঐ গ্রহের কোপে যে সব রোগ বা বিসম্বাদের সৃষ্টি হয়, প্রবাল বিশেষ প্রক্রিয়া মারফৎ শোধন করে ধারণ করলে ঐসব রোগ বা বিসম্বাদ নিবারিত হয়। হোক বা না হোক, এ বিশ্বাসকে কোনক্রমেই rational বলা যায় না। রোমকদের দু'একটা বিশ্বাসের কথা আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারি। Pliny লিখেছেন যে, রোমকরা বিশ্বাস করে purslain জাতীয় উদ্ভিদের অংশ মাদুলিতে ধারণ করলে মাথার এবং দাঁতের ব্যথা আরোগ্য হয়। এই রকম অনেক বিশ্বাসের কথা Plinyর পুস্তক পাঠে জানা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে ইতালীতে অনেক তাবিজ জাতীয় জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে, যা ইতালী-বাসীদের কুসংস্কারের সাক্ষ্য বহন করে। Plutarchএর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে Sulla যখনই যুদ্ধে যেতেন, ধাতুফলকে আঁকা একটি Apolloর ছবি শরীরে ধারণ করতেন, কারণ এটি শৌর্য, বীর্য ও জয়ের সূচক। সম্ভবত এ ধরনের বিশ্বাস গ্রীস থেকেই ইতালীতে এসেছিল।

ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ছবিও ঐ একই উদ্দেশ্যে অঙ্গে ধারণ করা হত। দেবদেবীদের ভয়াবহ মূর্তি রেখে দেওয়া হত দুর্ভাগ্য দূর করার জন্য। Hungaryতে যে রোমক দুর্গ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানে জিহ্বা বার করা একটি পাথরের তৈরি মুণ্ড পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে ঐ মূর্তির সাহায্যে রোমকরা তাদের শত্রুকে পরাভূত করবে এই ছিল তাদের বিশ্বাস। ঠিক আমরা যেমন আমাদের বাড়ির দরজায়, ভাঁড়ার ঘরে বা শয়নকক্ষে সৌভাগ্যজনক সব জিনিস রেখে থাকি, রোমকরাও তেমনি বাড়ির বিভিন্ন স্থানে, গরুর গলায়, কবরের পাশে, অশ্বকণ্ঠে বিভিন্ন বস্তু বেঁধে দিত, হয় আপদ দূরীকরণের আশায়, নয় সৌভাগ্য লাভের জন্য। এর প্রত্যেকটার পেছনেই, তারা একটা ঐশী শক্তি আছে বলে বিশ্বাস করত।

পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে Greco-Roman সভ্যতার বিচার করলে দুটো ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে ; প্রথম, এই মহান আর্য সভ্যতা পরিপুষ্ট হয়েছে অনেকাংশে অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রণে ; দ্বিতীয়, পরবর্তী যুগের ইউরোপীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে এই সভ্যতাকে ভিত্তি করে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে আমরা দেখি যে Greco-Roman সভ্যতার অনেক কুসংস্কারই গড়ে উঠেছে অনার্য প্রভাবে, যেমন দেখি ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতার ক্ষেত্রে। ধারণবিধির অনেকটাই এসেছে এদের কাছ থেকে। এই প্রসঙ্গে একদিকে যেমন দেখতে হবে আদিম জাতিকে, অন্যদিকে তেমনি Egypt, Assyria, Babyloniaর সুসভ্য জাতিদেরও। এই সব সুসভ্য জাতির মধ্যেও আমরা ধারণবিধির প্রচলন দেখতে পাই এবং সেগুলি ধর্মের অঙ্গ হিসাবেই ধরা হত।

Egypt বা মিশরের সভ্যতাকে জগতের প্রাচীনতম বলে গণ্য করা হয়। এই মিশরের প্রাচীন ইতিহাসের যা মালমশলা পাওয়া যায়, তা থেকে এটা খুব পরিষ্কার যে মিশরীয়দের মধ্যে ধর্ম এবং magic ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। E. A. W. Budge লিখিত Egyptian Magic বা A. Erman প্রণীত Handbook of Egyptian Religion প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে মিশরীয় সভ্যতার এই দিকটা আমাদের সামনে বেশ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। The Book of the Dead গ্রন্থে এইরকম কবজ-তাবিজের অনেক উল্লেখ আছে এবং এর নিদর্শন আমরা বিভিন্ন পিরামিড বা কবচের মধ্যেও পাই। একটা

ছোট্ট উদাহরণ আমরা এখানে নিতে পারি। Papyrusএর উপর একটি চোখ এঁকে ধারণ করাটা একটা মস্ত বড তুক বলে গণ্য করা হত। বিশ্বাস করা হত যে এতে ধারণকারীর স্বাস্থ্য, সম্পদ ইত্যাদি সবই নিরাপদ থাকবে। দেবদেবীর ছবিও সময়ে সময়ে এঁকে ধারণ করিয়ে দেওয়া হত। খুব সম্ভব মিশরবাসীদের কাছ থেকে গ্রীকরা এই প্রথাটি শিখেছিল।

প্রাচীন Assyrian ও Babylonian সংস্কৃতিতেও আমরা মিশরের অনুরূপ ধর্ম এবং magicএর সংমিশ্রণ দেখি এবং এদের মধ্যেও অনুরূপ ধারণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। সৌভাগ্যলাভের আশায় এরা যে শুধু দেহে কবচ বেঁধে রাখত তাই নয়, বাড়ির দেওয়ালে, দরজায় এবং অন্যান্য স্থানেও দেবদেবীর মূর্তি এঁকে বা মন্ত্র লিখে ঝুলিতে দিত। আমাদের দেশে যেমন মূল ধারণের প্রথা আছে, এদের মধ্যেও অনুরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে একটা বিশ্বাস প্রচলিত যে বাড়ির উপর মনসা গাছ রাখলে সে বাড়িতে আর বাজ পড়ে না। Frazer তাঁর Golden Bough (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে এইরকম একটা গাছ অনুরূপ উদ্দেশ্যে এরাও ব্যবহার করত এবং মধ্যযুগে বিশ্বাস করা হত যে ঐ গাছ বাড়িতে থাকলে ভূত আসে না।

এই সব বিশ্বাসের কতটা Greco-Romanরা নিজেরা নিয়েছিল এবং পরবর্তী যুগের মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে এর কতটা পেয়েছে তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে আমরা যে ধারণবিধির ব্যবস্থা দেখতে পাই তার যে অনেকটা heathen জগতের কাছ থেকে এসেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর মূলে রয়েছে জড়জগতের মধ্যে লুক্কায়িত প্রাণস্পন্দনের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে হয়ত Neo-Platonistদের চিন্তাধারা খানিকটা প্রভাবিত করে থাকবে, কিন্তু প্রাচীন চিন্তাধারার উপর অন্ধবিশ্বাস অনেকখানি কাজ করেছে। খ্রীষ্টসমাজে অবশ্য এ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে, তবে কবজ-তাবিজের প্রভাব সব যুক্তিতর্ককে তুচ্ছ করেই শতাব্দীর পর শতাব্দী এই সুসভ্য সমাজে বেশ জেঁকে বসে আছে। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে এরাই ভারতবাসীকে দেখে নাসিকাকুঞ্চন করে বলে এরা ভারি কুসংস্কারপরায়ণ, আর নিজেদের সংস্কারকে সব সময়েই একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দ্বারা সাফাই করতে চায়, তা সেটা টিঁকুক বা না টিঁকুক।

খ্রীষ্টান cross চিহ্নের কথাই ধরা যাক। crossকে সকলেই ভক্তি করে। জগতে একজন মহামানব, যিনি দেবপুত্র, তিনি একে চিরপবিত্র করে গেছেন। এটা কিন্তু ভক্তির কথা। ভক্তির দিকটা ছেড়ে দিলে ইতিহাসের প্রটভূমিকায় এর আর একটা দিক আছে। বিখ্যাত পণ্ডিত W. W. Seymour তাঁর The Cross in Tradition, History and Art গ্রন্থে এই দিকটার খানিকটা পর্যালোচনা করেছেন। আজও আমরা দেখতে পাই যে খ্রীষ্টানরা বুকে এবং কপালে হাত দিয়ে crossএর চিহ্ন স্মরণ করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এতে তাদের সব দুর্ভাগ্য দূরীভূত হবে। crossএর টুকরা দেহে ধারণ করে থাকলে সেই রকম সব দুঃখদুর্দশা দূর হয়ে যায়, এটা আজও খ্রীষ্টজগত বিশ্বাস করে।

ইতিহাস কিন্তু সাক্ষ্য দিচ্ছে যে খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্বেও সভ্য এবং অসভ্য নরগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন cross চিহ্নের ধারণ এবং ব্যবহার প্রচলিত ছিল। Encyclopaedia Heraldica গ্রন্থে W. Berry ৩৮৫ রকমের crossএর বিষয় উল্লেখ করেছেন। এর সবগুলিই যে ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা নয়, তবে অধিকাংশই সৌভাগ্যের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নরদেহে ধারণ করা হত। এই cross চিহ্ন থেকেই এসেছে স্বস্তিক চিহ্ন। সুসভ্য জার্মানীর Naziরা তাদের হাতে এই চিহ্ন ধারণ করত এবং তারা বিশ্বাস করত যে এটি সফলতার একটি প্রতীক। অনেক ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিকের মতে cross চিহ্ন বা স্বস্তিক সূর্যের প্রতীক। তাই খ্রীষ্টপূর্ব জগতে এটিকে ধারণ করা হত সুস্থ দেহ এবং নীরোগতা লাভের আশায়। কারণ, বিশ্বাস করা হয় যে সূর্য জীবনের প্রতীক এবং সূর্যের কৃপায় সব রোগই নিবারিত হয়। অবশ্য খ্রীষ্টজগতে এর পিছনে রয়েছে প্রগাঢ় ভক্তি এবং শ্রদ্ধা। সেখানে এর অর্থ অন্তরকম। মহামান্ত Gregoryর ভগ্নী Macrina তাবিজ হিসাবে একটি লোহার cross সব সময়ে গায়ে বেঁধে রাখতেন।

Cross ছাড়াও কত রকমের জিনিস যে ধারণ করা হয় তার নমুনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। কথিত আছে যে, Byzantineএ একজন নামকরা পাদরী মারা গেলে তার পোষাক, চুল, দাড়ি ইত্যাদি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, কারণ এইগুলি দিয়ে কবচ তৈরি হবে যা সাধারণ লোকে ধারণ করবে। সাধু ব্যক্তিদের কবরে ফুল, কাগজ ইত্যাদি ছুঁইয়ে তার টুকরা ধারণ করা

Roman Catholicদের মধ্যে একটা খুব বড় রকমের প্রথা। অবশ্য এটা স্বীকার করতে হবে যে ভক্তির একটা দাম আছে এবং ভক্তের কাছে ভগবান নানারূপে আবির্ভূত হন। এই ভক্তির মাধ্যমে তারা বিশ্বাস করত যে এতেই তাদের সর্ব বিঘ্ন দূরীভূত হবে। আজও হয়ত তাই হয়, কিন্তু যাঁরা rationalist তাঁরা এটাকে কুসংস্কারের পর্যায়ে ফেলতে চাইবেন। যাঁরা Neo-Platonic mysticismএ বিশ্বাসী তাঁরা হয়ত এর অন্য একটা ব্যাখ্যা দিতে চাইবেন। বস্তুত এই Neo Platonic চিন্তাধারাকে আশ্রয় করেই খ্রীষ্টজগতে অনেক ধারণ প্রথা প্রচলিত হয়েছে; যেমন সাধুসন্তদের ছবি ধারণ করা অথবা অসুখ করলে সাধুসন্তদের মূর্তি ধুয়ে সেই জল পান করা। আমাদের দেশেও পাদোদক পান প্রথা প্রচলিত আছে এবং অসুখের সময় ঠাকুমা-দিদিমারা আজও দেবদেবীর চরণামৃত ভক্তিভরে নাতি-নাতনীদের পান করিয়ে থাকেন।

খ্রীষ্টীয় ধর্মজগতে কতকগুলি বিশ্বাস চলে এসেছিল ভিন্ন সমাজ থেকে। এর ফলে রত্ন, ধাতু, মূল ইত্যাদির ধারণ মধ্যযুগে প্রচলিত হয়। যেমন বিশ্বাস করা হত Amber ধারণ করলে জ্বর এবং বাত আরোগ্য হয়। Opel এবং Amaetheystএর মধ্যে অদ্ভুত শক্তি লুক্কায়িত আছে বলে বিশ্বাস করা হত এবং যাঁরা এগুলি ধারণ করতেন খানিকটা ঝুঁকি নিয়েই করতেন; হয়ত ভাল হবে, নতুবা অমঙ্গল হবে। স্বর্ণধারণে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি এবং সীসাধারণে জীবনীশক্তির ক্ষয়,—এও ছিল মধ্যযুগের বিশ্বাস। Apollonius of Tyana সপ্তাহে প্রতিদিন এক একটি করে নূতন আংটি ধারণ করতেন, কারণ বিভিন্ন ধাতুর বিভিন্ন অন্তর্নিহিত শক্তি আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। প্রেমিকার মন গলানর জন্য, বন্ধ্যার সন্তানলাভ আশায় বিভিন্ন ধারণ ব্যবস্থার নজীর পাওয়া যায়। Chrysostomএর বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে রোগীর গলায় বিভিন্ন ধরনের তাবিজ বৃদ্ধারা বেঁধে দিতেন। ঐ তাবিজের মধ্যে বিভিন্ন ছবি আঁকা থাকত। এগুলিকে অনেকটা আমাদের তান্ত্রিক যন্ত্র ধারণের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আরও কত অদ্ভুত প্রথার সাক্ষ্য রেখে গেছে ইতিহাস। বিশ্বাস করা হত যে Antonius Medal গরুর গলায় বেঁধে দিলে তাদের প্রতি আর উপদেবতার দৃষ্টি পড়বে না। শিশুদের গলায় খুব ছোট্ট ছোট্ট ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হত,—তার আওয়াজে ভূত পালাবে।

নজীর বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। এটা এখন স্পষ্টই প্রতীয়মান যে ধারণবিধি শুধু কুসংস্কারবাদী ভারতবাসীর একচেটিয়া জিনিস নয়। সর্বযুগে মানুষের সর্বস্তরে এর প্রচলন। এই বিধিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব যে এর পিছনে দুটি চিন্তাধারা কাজ করছে, একটা হচ্ছে কাম্যবস্তু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, আর একটা হচ্ছে অজানা ভয়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়া। যিনি এই দুই-এর উর্ধ্বে গেছেন, তিনি মহাপুরুষ, কিন্তু সাধারণ মানুষ এই দুইয়েরই দাস। মুখে সে যত বড় বড় বুলি আওড়াক, বিজ্ঞানের যত নজীরই টেনে আনুক, মনের মধ্যে কিন্তু কাজ করছে, তার এই দুটি কামনা-বাসনা। আধুনিক শিক্ষিত পাশ্চাত্য জগত ধারণবিধির পিছনে ধর্মের প্রভাব স্বীকার না করে চাইছে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা যে মোটেই বৈজ্ঞানিক নয়, এখানে যে কুসংস্কারটাই বিজ্ঞানের প্রলেপে ঢাকা, খোলা মনে একটু বিচার করলেই তা বোঝা যায়। ধরুন, পাশ্চাত্য জগতে বহুধা প্রচারিত Science of numerologyর কথা। আজ এই সংখ্যাতত্ত্বের উপর সবচেয়ে সেরা পুস্তক হল Cheiroর Book of Numbers. এতে বিষয়টার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং ধারণের বিষয়ও প্রচুর আছে। এরকম বই আরও অনেকে লিখেছেন; আমরা এর মূল বক্তব্যটুকু প্রথমে আলোচনা করতে পারি।

ধরে নেওয়া হয়েছে যে ইংরেজী মাসের বিভিন্ন তারিখের উপর বিভিন্ন গ্রহের প্রভাব বর্তমান। গ্রহ-সন্নিবেশে আমরা এইভাবে তারিখগুলি সাজাতে পারি, যে ভাবে সংখ্যাবিদ্‌রা বলেছেন—

আপনি যদি কোন মাসের

১, ১০, ১৯ বা ২৮ তারিখে জন্মে থাকেন, তাহাল আপনার কারক গ্রহ রবি
২, ১১, ২০ বা ২৯ „ „ „ „ „ „ „ চন্দ্র
৩, ১২, ২১ বা ৩০ „ „ „ „ „ „ বৃহস্পতি
৪, ১৩, ২২ বা ৩১ তারিখে জন্মে থাকেন, তাহলে আপনার কারক গ্রহ হার্সেল
৫, ১৪ বা ২৩ „ „ „ „ „ „ „ বুধ
৬, ১৫ বা ২৪ „ „ „ „ „ „ „ শুক্র
৭, ১৬ বা ২৫ „ „ „ „ „ „ „ নেপচুন
৮, ১৭ বা ২৬ „ „ „ „ „ „ „ শনি
৯, ১৮ বা ২৭ „ „ „ „ „ „ „ মঙ্গল

(অনেক সংখ্যাবিদ্ আবার শনি ও মঙ্গলের তারিখের বিনিময় করেন, অর্থাৎ ৮, ১৭, ২৬ মঙ্গল এবং ৯ প্রভৃতি শনি)

তারপর প্রত্যেক গ্রহের জন্য এক গাদা করে রত্নের তালিকা, আপনার তারিখ জেনে নিয়ে আপনি ধারণ করুন। যদি দেখেন কোনও গ্রহ, যেমন শনি বা মঙ্গল, আপনার বিরুদ্ধাচরণ করছে, তাহলে অন্য কোনও গ্রহের রত্ন আপনি ধারণ করুন, একেবারে আপনার ভাগ্য বদলে যাবে। এখন বুঝবেন কিসে? এরা যে আপনার মন্দ করছে সেটা যাচাই করে নিন, ঐ নম্বরের বাড়িতে থেকে ; ঐ তারিখে কাজ করে অথবা ঐ নম্বরের সঙ্গে যুক্ত অন্য কোন প্রক্রিয়ায়। সংখ্যাবিদ্‌দের বিধান যে ৮ নম্বরের অথবা ৮, ১৭, ২৬ তারিখে জাত লোকেদের ৮ নম্বরের সব জিনিস ত্যাগ করা উচিত। ধরুন আপনি ৫৩ নম্বরের একটি বাড়িতে বাস করেন। কর্পোরেশন অফিসে যান, গিয়ে শুধু নম্বরটা বদলে নিন, কেবল যেন মঙ্গলের কোন নম্বর না হয়। তাহলে ৫৩, ৫+৩=৮ অর্থাৎ শনি আর আপনাকে পীড়া দিতে পারবেন না। আপনার ভাগ্যাকাশে দেখবেন পূর্বদিকে তরুণ সূর্যের উদয় হচ্ছে। বিধান সত্যিই অপূর্ব! অথচ, পাশ্চাত্য জগৎ এই তথাকথিত বিধানের আদর দেন, এ বিধি মেনে চলেন ; যদিও তাঁদের চোখে ভারতের লোকেরা কুসংস্কার পঙ্কে নিমগ্ন।

আমরা যদি ভারতের ধারণবিধির সঙ্গে পাশ্চাত্য ধারণবিধির তুলনা করি তাহলে দেখব যে ষোড়শ শতাব্দী অবধি দুদেশেরই বিধি ছিল এক পটভূমিকায় ; অর্থাৎ ধর্মকে কেন্দ্র করেই এ দুটি জগতে ধারণবিধির প্রসার লাভ। তারপর ইউরোপে আরম্ভ হয় rationalismএর প্রভাব, তখন ধর্ম ছেড়ে দিয়ে এর একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুঁজে বার করার চেষ্টা চলে। ভারত কিন্তু তার পুরাতন পথকেই ধরে থাকে, তার ধারণবিধি চলতে থাকে ধর্মকেই কেন্দ্র করে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অবশ্য সংস্কারকে কেন্দ্র করেই এটা চলছে। দুঃখের বিষয়, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে পৌঁছায় নি। এখানে বিজ্ঞানের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে মাত্র। শিক্ষিত ও ভদ্রেরা কবচ বা রত্ন ধারণ করেন necklace, bracelet প্রভৃতি গহনার মাধ্যমে, অন্যেরা ধারণ করেন প্রত্যক্ষভাবে। মূলত দুটো একই। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন যে ধর্মের উপর magicএর প্রভাব থেকে ধারণপ্রথার উৎপত্তি। Haddon তাঁর Magic and Fetishism গ্রন্থে (পৃঃ ২৯) ধারণীয় বস্তুগুলিকে দু'ভাগে ভাগ

করেছেন,—কতকগুলি ধারণ করা হয় দুর্ভাগ্য দূরীকরণের জন্য এবং কতকগুলি সৌভাগ্য উদয়ের জন্য। যে কারণেই হোক, মানুষ চিরদিনই কামনা-বাসনার দাস। কোনও অবস্থাতেই সে তৃপ্ত নয়, আর এই অতৃপ্ত বাসনা থেকেই ধারণবিধির উদ্ভব। যদি সে নিজের অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারত, তাহলে জগত হত আজ অন্যরকম। এত হানাহানি, মারামারির অবসান ঘটত। হয়ত রোগে বা দুঃখে এমন অবস্থা আসে যখন তার পক্ষে শান্ত থাকা সম্ভব নয়। তাই সে একটা কিছু ধারণ করে। আবার অনেক সময় সৌভাগ্যবানরা ধারণ করেন আরও শ্রীবৃদ্ধির আশায়। Haddon তাই ধারণীয় বস্তুগুলিকে talisman এবং amulet এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ভারতের মত পাশ্চাত্য জগতেও ধারণব্যবস্থা চলেছে। তফাৎ এই যে আধুনিক কালে তাঁরা দেন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, আর আমাদের দেশে বলা হয় দেবতার কৃপা। তবে আধুনিক অনেক পণ্ডিত আমাদের দেশেও এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। যেমন গ্রহরত্ন ধারণের বেলায় তাঁরা বলেন মানবদেহে এ সমস্ত রত্নাদি এক প্রভাব বিস্তার করে যাতে গ্রহের কোপ প্রশমিত হয়ে সৌভাগ্যোদয় হয়। মানব দেহের উপর এদের প্রভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি বা অবনতি হতে পারে, কিন্তু সোজাসুজি ভাগ্যোন্নতি হবে কি করে? সংস্কারকে চাপা দেওয়ার জন্য যুক্তির অবতারণা, কিন্তু সংস্কার পিছন থেকে উঁকি মারছে।

পাশ্চাত্য জগতের আর একটি নমুনা দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করব। Chiroর কথা পূর্বে বলেছি Science of numerology প্রসঙ্গে, যার প্রকৃত বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা প্রমাণ আমরা খুঁজে পাই নি। তাঁর আর একখানি পুস্তিকাতে তিনি প্রত্যেক মাস অনুযায়ী ধারণের ব্যবস্থা দিয়েছেন, মাসটা অবশ্য আরম্ভ করেছেন ইংরাজী মাসের ২০ তারিখ থেকে; কারণ তাঁর মতে ২০ তারিখ থেকেই একটা করে রাশি আরম্ভ হয়। যেমন, ২০শে মার্চ থেকে ২০শে এপ্রিল Aries অর্থাৎ মেষরাশি, ২০শে এপ্রিল থেকে ২০শে মে Taurus অর্থাৎ বৃষরাশি। মেষরাশির ধারণীয় রত্ন পলা, blood stone প্রভৃতি; বৃষরাশির পান্না, ফিরোজা ইত্যাদি। এখন ধরুন ৮ই এপ্রিল একজনের জন্ম। তাহলে number অনুসারে তার ধারণ করতে হবে নীলা ইত্যাদি, কারণ ৮ই হল শনির সংখ্যা; কিন্তু মাস বা রাশি অনুসারে সে ধারণ করবে পলা ইত্যাদি। তাহলে তার কোনটা ধারণ করা উচিত? এদিকে

সংখ্যাবিদ্‌রা আবার বলেছেন যে শনি ও মঙ্গল পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন ; সুতরাং এক নম্বরের লোকের আর এক নম্বরের পাথর ধারণ করা উচিত নয়। অতএব মহামুস্কিল। তাঁরা তখন বিধান দেন যে অন্যরাশি বা নম্বরের পাথর এঁদের ধারণ করা উচিত। কিন্তু কোন প্রথায় ? তার উত্তর নেই।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ধারণের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ধোপে টেঁকান মুস্কিল। তবু যাঁরা ধর্মের কথা বলেন, খানিকটা তার মানে আছে। দেবতার কৃপাভিক্ষা সব সময়েই করতে পারা যায় এবং দেবকৃপায় সবই সম্ভব, যদিও একদল বলবেন এটাও কুসংস্কার। কুসংস্কার নিশ্চয়, কারণ ধর্মকে এখানে একধাপ নামিয়ে আনা হয়েছে, তবে এ ধর্মের মধ্যে rationalismএর ভণ্ডামি নেই। যাঁরা ধারণ করেন, তাঁরা অন্ধ-বিশ্বাসেই ধারণ করেন, সাফাই গাইবার চেষ্টা করেন না। এই rational ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন Neo-Platonistরা, বিশেষ করে যাঁরা পরবর্তী যুগের। এ যুগটা ইউরোপে কদর্য রূপে আরম্ভ হয় Porphyry of Tyre (খ্রীঃ ২৩২-৩০৪)-এর সময় থেকে এবং শিষ্যপরম্পরায় এঁর ধারা কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপে প্রবাহিত হয়। Porphyry ছিলেন Plotinusএর শিষ্য। এঁর সম্বন্ধে একজন লিখেছেন :

> "He lays greater emphasis than the master on asceticism and the popular religion as means of purification and hence accepts all kinds of superstitious beliefs and practices, such as demonology, prophecy, idolatory, magic and theurgy."

এঁদের প্রভাবেই খ্রীষ্টধর্মে প্রচুর কুসংস্কার এসে জড়ো হয়। এঁদের প্রভাবেই সম্ভবত পাশ্চাত্যবাসীরা শেখেন সোনা ফেলে শূন্য আঁচলে গেরো বাঁধা। এই ধারা একবার প্রবাহিত হলে রোধ করা মুস্কিল। আজ যাঁরা ধারণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে চান, তাঁরা এঁদেরই উত্তরসূরী।

* * * *

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য, এই উভয় ধারণ বিধিরই প্রচলন হয়েছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে, যদিও পরে পাশ্চাত্যজগতে এই ধর্মভিত্তিক প্রথার একটা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। কোন কোন মনস্তাত্ত্বিক ধর্মের মধ্যে এই

কুসংস্কার এসে পড়ার কারণ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছেন। আমরা সেই সব যুক্তি নিয়ে এখানে একটু আলোচনা করতে পারি।

হয়ত কোন একটি বিশেষ দ্রব্য একটু অদ্ভুত আকারের বা অদ্ভুত রঙের। এটি কোন রকমে একজনের অধিকারে আসার পরেই হঠাৎ তার ভাগ্যোদয় হল। এই কথাটা ক্রমে ক্রমে সমাজে ছড়িয়ে পড়ল এবং এই থেকে একটা সাধারণের বিশ্বাসের সৃষ্টি হল যে ঐরকম দ্রব্য সৌভাগ্যবর্ধক এবং ঐ দ্রব্যটিকে কেন্দ্র করে বহু বিচিত্র কাহিনীর উদ্ভব হতে লাগল।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে বাড়ির কোন পুরাতন জিনিস নষ্ট হয়ে গেলে তাকে অমঙ্গলসূচক বলে ধরে নেওয়া হয়। আমাদের দেশে সোনার গহনা হারিয়ে যাওয়া বা পাথরের থালাবাটি প্রভৃতি জিনিস ভেঙে যাওয়াকে এই অমঙ্গলের পর্যায়ে ফেলা হয়। এখানেও খোঁজ করলে দেখা যাবে যে এ রকম ঘটনা ঘটায় হয়ত কোন পরিবারে কিছু অমঙ্গল হয়েছিল এবং পরে সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই কুসংস্কারের উদ্ভব।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে কোন কোন সময়ে একটা লোকের সামান্য কথাকে কেন্দ্র করে এই রকম বিশ্বাসের উদ্ভব হয়। ধরুন একজন একটি বিচিত্র আংটি হাতে পরেছেন। হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল তাঁর এটি ধারণের কোন কারণ আছে কিনা। তিনি কৌতুকচ্ছলে বললেন যে এটি সৌভাগ্যদায়ক এবং তাঁর বংশে অনেকেই এটি ধারণ করে সৌভাগ্যলাভ করেছে। তার পরে দেখা যাবে যে সৌভাগ্যলাভের আশায় অনেকেই সেই রকম আংটি ধারণ করেছেন, যদিও এই ধারণের মূলে কোন ভিত্তিই নেই। Haddon লিখেছেন যে বহু দেশেই লাল পাথরকে মনে করা হয় রক্তের পক্ষে বিশেষ উপকারী, সাদা চর্মের পক্ষে এবং মেঘ রঙের বা ধূসর রঙের স্বচ্ছ পাথর চোখের পক্ষে হিতকারী। এখানে সাদৃশ্যবিধানের প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ আমরা খানিকটা দেখতে পাই,—রক্ত লাল তাই লাল পাথর রক্তের পক্ষে, স্বচ্ছ চক্ষুর পক্ষে স্বচ্ছ পাথর উপকারী; ইত্যাদি ইত্যাদি। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে এই সাদৃশ্যবিচার সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়া যায়। যখন তাদের দেশে প্রচুর নারিকেল ফলে তখন তারা গাছের গায়ে জাহাজের ছবি এঁকে বেঁধে দেয়। তাদের বিশ্বাস যে এর জোরে তাদের দেশে নারিকেল কিনতে নাবিকরা হাজির হবে। তেমনি কুমীরের উৎপাত হলে তারা সমুদ্রের ধারে কুমীরের মূর্তি করে রাখে। তাদের বিশ্বাস তাহলে আর কুমীর আসবে না।

এখানে আমরা এই সাদৃশ্যবিধানের অবতারণা করলুম কারণ আমাদের দেশের একদল জ্যোতিষী এই রঙের উপর ভিত্তি করেই ধারণব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। যেমন চন্দ্র সাদা, মঙ্গল লাল, বুধ সবুজ, বৃহস্পতি পীতাভ, শুক্র অত্যুজ্জ্বল, শনি নীল ইত্যাদি। এই মতবাদের উপর ভিত্তি করেই একদল বিধান দিয়ে থাকেন—

মাণিক্য মুক্তাফল বিদ্রুমাণি—
গারুত্মতং স্যাদয়ঃ পুষ্পরাগঃ।
বজ্রং চ নীলাং চ নবক্রমেণ
গোমেদ বৈদূর্য্যযুতানি তানি।

অর্থাৎ নয়টি গ্রহের নয়টি রত্ন হল,—মাণিক্য (সূর্য), মুক্তা (চন্দ্র), প্রবাল (মঙ্গল), গারুত্মত বা পান্না (বুধ), পুষ্পরাগ বা হলদে পোখরাজ (বৃহস্পতি), হীরক (শুক্র), নীলা (শনি), গোমেদ (রাহু) ও বৈদূর্য্য (কেতু)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ধারণবিধির একমতে অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হল রঙের সাদৃশ্য। কিন্তু আমরা আরও একটি বচন পাই যার মধ্যে আমরা এ যুক্তিকে খুঁজে পাই না। বচনটি হল এইরকম ;

শিব পার্বতীকে বলছেন :

বৈদূর্য্যং নীলমাণিক্যে পদ্মরাগং চ মৌক্তিকম্।
বজ্রং পবেশং গোমেদং মরকতং ক্রমাৎ প্রিয়ে ॥

অর্থাৎ

রবির জন্য বৈদূর্য্য, চন্দ্রের নীলা, মঙ্গলের চুণী বা মাণিক্য ইত্যাদি। এ বিধানের কোন দিক দিয়েই কোন যুক্তি পাওয়া যায় না, অথচ বাংলাদেশে এ মতের খানিকটা প্রাধান্য আছে। বিদেশী ধারণবিধির মধ্যেও আমরা এইরকম একটা অদ্ভুত প্রচলন দেখি এবং কি পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে এ মত প্রতিষ্ঠিত তা নির্ণয় করা কঠিন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিধান বৃহস্পতির জন্য Amaetheyst, চন্দ্রের জন্য মুক্তা, শুক্রের জন্য পান্না ইত্যাদি। সাদৃশ্য-বিধানে চন্দ্রের জন্য মুক্তাকে গ্রহণ করা যায় কিন্তু অন্যগুলির কোন সাফাই পাওয়া মুস্কিল। আমাদের দেশে আরও একটা মত প্রচলিত আছে। সেটি হল উপরের দুটি মতের সংমিশ্রণ এবং কতকটা নূতনও বটে এবং তারও মূলে কি যে যুক্তি আছে তা অন্তত আমরা জানি না।

বৈদূর্য্যং (মতান্তরে মাণিক্যং) বিগুণে সূর্যে নীলক শশলাঞ্ছনে।

প্রবালং ভূমিপুত্রে চ পদ্মরাগং শশাঙ্কজে।
গুরৌ মুক্তান্ ভৃগোঃ বজ্রং ইন্দ্রনীলং শনৈশ্চরে
রাহৌ গোমেদকং ধার্য্যং কেতৌ মরকতংস্তথা॥

ধাতুধারণের যে ব্যবস্থা আছে তা অতি বিচিত্র। এটা পাঠ করলেই বোঝা যায় যে কুসংস্কার মানুষের জ্ঞানটাকে কতদূর অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে পারে। রাজমার্তণ্ড পুস্তক থেকে নীচে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

"দোষো ন স্যাদ্ গ্রহাণামশিশিরকিরণে তাম্রমিন্দৌ চ শঙ্খং
পৃথ্বীপুত্রে প্রবালং শশধরতনয়ে শাতকৌম্ভং ভৃজেন।
দেবাচার্যে চ মুক্তাং মণিমসুরগুরৌ সীসকং সূর্যসূনৌ
রাহৌ লোহং ত্বরিষ্টে মলয়জতনয়ে রাজপট্টং বিভর্তুং ইতি॥"

এ শ্লোকটি দেওয়া আছে গ্রহধাতুর বিধানে। এখন প্রবাল, মুক্তা বা মণি (হীরক) কোন অর্থে ধাতু হল তা নির্ণয় করা-সত্যই কি কঠিন নয়? তবে আমাদের ধর্মকে ধরে এ বিধানও তার স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু এর চেয়ে আরও অদ্ভুত যখন দেখি আধুনিক rationalistরা এ সমস্তই মেনে নিচ্ছেন এবং প্রকাশ্যে না হোক গোপনে কত অদ্ভুত জিনিস ধারণ করছেন। ধাতু দ্রব্যের হয়ত মানবদেহে প্রভাব থাকতে পারে, কারণ অনেকেই বাত রোগাক্রান্ত হয়ে তামার বালা হাতে ধারণ করেন এবং বলেন তাতে নাকি ফলও হয়। তামার হয়ত সেদিক দিয়ে ক্ষমতা আছে। কিন্তু অর্থাগম অথবা অন্যান্য ইষ্টসাধনের জন্য তাম্রধারণের সার্থকতা কি? কিন্তু এরকম অনেক বিধান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা দিয়ে থাকেন।

মনস্তাত্ত্বিকরা যাই বলুন ধারণবিধির মূলে রয়েছে আমাদের সেই চিরন্তন চাওয়া-পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষাই আমাদের বুদ্ধিভ্রংশ করে, আমরা অহেতুক জিনিসের পিছনে ছুটে যাই। মধ্যযুগের সন্তরা এইটে লক্ষ্য করে মানুষকে উপযুক্ত পথে চালাবার জন্য বার বার ঘোষণা করেছেন যে ভগবানের নামে, ঐকান্তিক প্রার্থনায় সব কিছুই হবে। তাঁরা বুঝেছিলেন এই সব কুসংস্কারের পিছনে দৌড়তে বারণ করলে ফল হবে না। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ চিরদিন ছুটবে। যখন উপায়ান্তর নেই তারা ছুটুক ভগবানের দিকে। বাল্মীকির মত মরা মরা বলতে বলতে হয়তো এরা একদিন রামের দর্শন পাবে।

সতীদাহ

নারী পুরুষের কাছে তার যোগ্য মর্যাদা কোনও দিনই পায় নি। কথাটা যতই শ্রুতিকটু হোক ইতিহাসের পাতায় এই কটুতার ছাপ থেকে গেছে। অবশ্যই এর একটা কারণ হল যে নারীর তুলনায় পুরুষ বেশি শক্তিমান; আর পুরুষ তার এই শক্তির সুযোগ চিরদিনই নিয়েছে। ছলে, বলে, কৌশলে সে চিরদিনই নারীকে দমিয়ে রেখেছে। সমাজের প্রত্যেক স্তরেই এ জিনিসটা ফুটে উঠেছে। যাঁরা রুচি এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন, তাঁরা এ উদ্দেশে প্রয়োগ করেন ছল বা কৌশল, পরোক্ষে থাকে বাহুবলের ভীতি, আর অসভ্য বর্বর তার দৈহিক বলে নারীকে দমিয়ে রেখে দেয়।

নারীর দিক দিয়ে সমাজের দিকে তাকালে চোখের সামনে ভেসে ওঠে দুটি স্তর। ইংরেজীতে এ দুটি স্তরের নাম patriarchal বা পিতৃকেন্দ্রিক society এবং matriarchal বা মাতৃকেন্দ্রিক society; প্রথম সমাজে পিতা বা পুরুষ প্রধান, অর্থাৎ এখানে সব কিছুরই বিচার হয় পুরুষের মাপকাঠিতে। পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকার। এ সমাজে পুরুষই সর্বময় কর্তা। অন্য সমাজে অর্থাৎ মাতৃকেন্দ্রিক সমাজে মাতা বা নারী আইনত প্রধানা। মায়ের সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার, পুত্রের নয়। প্রথম সমাজে শ্বশুরালয়ে যায় কন্যা, কিন্তু দ্বিতীয় সমাজে শ্বশ্রূমন্দিরে গমন করে পুরুষ। মাতৃকেন্দ্রিক সমাজের এই ধারা হলেও নারীকে নির্ভর করতে হয় সব বিষয়েই পুরুষের উপর, কারণ তার দেহের শক্তি কম। আইন মারফত সম্পত্তি যার হাতেই আসুক, শেষ পর্যন্ত এ সমাজটা চালানর ভার এসে পড়ে পুরুষদের হাতেই। কাজেই, শেষে হয় পুরুষেরই জয় এবং মাতৃকেন্দ্রিকতার ছাপ মাত্র রেখে সমাজের আইন সেইভাবে বদলে দেওয়া হয়। আসামের খাসিয়া প্রভৃতি জাতি এবং দক্ষিণাপথের নায়ার প্রভৃতি এই সমাজের অধীন। কিন্তু পুরুষরাই ত চালাচ্ছে এ সমাজ, কি রাজনীতির ক্ষেত্রে, কি অর্থনীতির ক্ষেত্রে। অর্থাৎ এর মূল চিত্র এখন অনেকটা বদলে গেছে। উত্তরাধিকার প্রথাও নূতন ছাঁচে ঢেলে নেওয়া হয়েছে কোন কোন দলের মধ্যে।

আর্য সমাজের ধারা পিতৃকেন্দ্রিক। তাই, যেখানেই আর্য সমাজ সেখানেই পুরুষের প্রতিপত্তির বিস্তার। জগতে মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ খুব অল্প আছে এবং যে সামান্য মরূদ্যানের মত দু'একটা আছে, তাও অন্য সমাজের প্রভাবে প্রায় প্রাণহীন। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে সুপ্রাচীন যুগে ভারতে আর্যবসতি স্থাপিত হবার পর তাদের সঙ্গে তদানীন্তন দু'একটি মাতৃকেন্দ্রিক সমাজের ধীরে ধীরে আপোষ হয়। এই আপোষের ফলে আর্যসমাজে একটা নূতন নিয়ম হয়; যাকে আমরা স্ত্রীধনাধিকার বলি; স্ত্রীধনে কন্যার অধিকার। অপরদিকে, এই আপোষের ফলে মাতৃকেন্দ্রিক সমাজে হয় পুরুষদের অধিকারের বৃদ্ধি। আমাদের আইনসভা অনেক আইনই পাস করেছেন। একটি আইন করা হয়েছে, মেয়েদের পিতার সম্পত্তিতে খানিকটা অধিকার। এতে মেয়েদের উপকার কতটা হয়েছে বলা শক্ত; উত্তরাধিকার নিয়মে কতকগুলি জট বেড়েছে, হয়ত আইনজ্ঞদের আয়ের একটা নূতন রাস্তা খুলে গেছে, কোর্টে বিচারকদের আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে।

এখনকার অবস্থা যাই হোক, কিছুদিন আগে অবধি আমাদের সমাজে নারীর অবস্থা ছিল কত করুণ। যাঁরা এ মতের বিরোধী তাঁরা বলবেন, আমাদের পুরুষের প্রতীক শিব শক্তির পায়ের তলায় বুক পেতে দিয়েছেন, আমাদের সমাজে কুমারী পূজার প্রচলন। সবই ঠিক। পাশের বাড়ির কুমারী আমার বাড়িতে গৌরী হয়ে পূজা নিয়ে গেল। তার পা ধোয়ান হল, আলতা পরান হল। নূতন বস্ত্রে তাকে সাজিয়ে তার ভোজ্য দেওয়া হল। কিন্তু সে কুমারীর বাড়ি ফিরতে দেরী হয়েছে। বাপ মা ক্রোধে আগুন। বললেন, বুড়ো মেয়ে আক্কেল নেই, শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে না? 'মথুরাপুরী শ্বশুরবাড়ি'র ভয় মেয়েদের জ্ঞান হতে হতেই তারা লাভ করে। 'শাশুড়ীর ঝাঁটা' সব মেয়েরেই বিভীষিকা। তার ওপর যদি থাকে জটিলা কুটিলা ননদ। শ্রীরাধার জটিলা এবং কুটিলা নামে দুই ননদ ছিল কিনা, ইতিহাসে তার প্রমাণ নেই। এ দুটি ননদদের চিরন্তন বিশেষণ বলেই মনে হয়।

মনুর বিধানে মেয়েদের 'স্বাতন্ত্র্য' নেই। কুমারী অবস্থায় পিতার অধীন, বিবাহের পর স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের (মনুসংহিতা, ৯,৩)। অন্য শাস্ত্রকারদেরও তাই মত (বশিষ্ঠ, ৫,৩; বৌধায়ন, ২,৩,৪৪; যাজ্ঞবল্ক্য,

১,৮৫)। এই সব থেকেই বোঝা যায় যে আমাদের সমাজে নারীর স্থান কোথায়। সেটা আরও বোঝা যায় পরিষ্কারভাবে যখন আমরা সংসারে দেখি বিধবা নারীর অবস্থা, যদি তিনি গৃহকর্ত্রী ও সন্তানবতী না হন। এমন বিধবা সংসারের জঞ্জাল। বিধবা যদি যুবতী হয় সমস্যার আর অন্ত নেই ; সন্তানবতী হলেও।

প্রাচীন যুগে এ সমস্যার সমাধান হত সতীপ্রথায়। স্ত্রীকে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে হবে। এ প্রথা আমরা যেমন আর্যজাতিদের মধ্যে পাই, তেমনি মঙ্গোলীয় জাতির মধ্যেও পাই। আফ্রিকাতে কোনও কোনও জাতির মধ্যে এর নজীর পাওয়া যায়। সহ-মরণ প্রথা ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দ অবধি আমাদের দেশেও প্রচলিত ছিল। ঐ বৎসর Lord William Bentinck আইন করে এ প্রথাটি তুলে দেন। সতী নামের সার্থকতা সহজেই বোঝা যায় শিবের উপাখ্যানে। শিবের শ্বশুর দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞ করছেন, তাতে শিব বা তাঁর স্ত্রী সতী নিমন্ত্রিত হলেন না। স্বামীর এই অপমানে সতী দেহত্যাগ করেন। স্বামীর জন্যে দেহত্যাগের নাম এই জন্যে হল সতীপ্রথা। কিন্তু সতীর দেহত্যাগ এবং সতীপ্রথার মধ্যে একটা প্রভেদ আছে। সতী দেহত্যাগ করলেন তাঁর স্বামীর জীবিত অবস্থাতেই, সতীপ্রথা পালিত হয় স্বামীর মৃত্যুর পর।

যেখানে পিতৃকেন্দ্রিক সমাজ সাধারণত সেখানেই এই সতীপ্রথার চলন। মাতৃকেন্দ্রিক সমাজের মধ্যে এ প্রথার প্রচলন নেই বললেই চলে ; যদি দেখা যায়, বুঝতে হবে যে সে সমাজ অন্য সমাজের দ্বারা খানিকটা প্রভাবিত হয়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক। Patriarchal বা পিতৃকেন্দ্রিক সমাজে পুরুষের প্রভাব। পুরুষ ভোগের অধিকারী ; এ জীবনে তার ভোগের বস্তু স্ত্রী, পরজীবনেও তাকে তার চাই। কাজেই স্বামী যখন পরপারে যাবে, স্ত্রীকেও যেতে হবে পরপারে তার সঙ্গে। Schrader তাঁর Prehistoric Antiquities of the Aryan People (London, ১৮৯০, পৃঃ ৩৯১) গ্রন্থে বেশ সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন যে আর্যজাতির মধ্যে এই রকম একটা প্রথা এবং চিন্তাধারা সুপ্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছে। এ ধারা পিতৃকেন্দ্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য, যেখানে পুরুষই সব। এরই আরেকটা রূপ 'পতি পরম দেবতা'। সে দেবতার চরিত্র যাই হোক, তিনি মাতাল, উচ্ছৃঙ্খল যাই হোন, স্ত্রীর কাছে তিনি দেবতা ছাড়া

আর কিছু নন। স্বামীর অত্যাচার দেবতার প্রসাদ, মুখ বুজে সহ্য করতে হবে।

কামনা-বাসনা-ভোগ-লিপ্সাভিত্তিক এই যে নারীহনন প্রথা, এটাকে কি বলা উচিত—সামাজিক না ধর্মীয়? সব দেশেই কিন্তু ধর্মের সঙ্গে বা ধর্মীয় কুসংস্কারের সঙ্গে এর একটা যোগ এবং সেটা হতে বাধ্য। এ প্রথার প্রচলন মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। মৃত্যু প্রাণীজগতে চিরবিভীষিকাময়, ঐখানে কামনা-বাসনার সব শেষ। সেটা ভাবতেও মানুষ ভয় পায়, মনকে সান্ত্বনা দেয়—না, এর পরেও একটা কিছু আছে, যেখানে সে তার ভোগের সব কিছুই পাবে। কামনা-বাসনার দ্বার রুদ্ধ করে যে মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ডিঙিয়ে আর একটা কামনা-বাসনার রাজ্য তৈরি করতে হলেই এসে পড়ে ধর্ম এবং তাকে ঘিরে কতকগুলি সংস্কার। তাই নারীহনন, এটাও একটা ধর্মীয় সংস্কার। আমাদের শাস্ত্রে অবশ্য ধর্ম শুধু religion নয়; আরও কিছু—

শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্॥*

শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার এবং নিজের বিবেক এই চারটি ধর্মের লক্ষণ, বা এই চারটিকে কেন্দ্র করে ধর্ম স্থাপিত। এখন মুস্কিল হল এই সদাচার নিয়ে। ভারতে বিভিন্ন জাতি, তাদের বিভিন্ন আচার। আমাদের দেশে যেটি সদাচার, অন্য দেশে সেটি অতি কদর্য আচারও হতে পারে। একটা উদাহরণ নিলেই বোঝা যাবে। দাক্ষিণাত্যে মাতুলকন্যা অথবা পিতৃস্বসাকন্যাকে বিবাহ করা সদাচার, কিন্তু আমাদের চোখে এটি অতি ঘৃণ্য। তাই দাক্ষিণাত্যবাসীর কাছে যা সদাচার, আমাদের কাছে তা অন্যরূপ। এরকম অনেক উদাহরণই যোগাড় করা যায়। ইতিহাসের দিক দিয়ে এর অবশ্য একটা মানে আছে। আর্য সমাজের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতি স্থান পেয়েছে। আর্যদের কাছে মাথা নুইয়ে এ সমাজে এরা ঢুকেছে, কিন্তু এদের স্বাতন্ত্র্য এবং সামাজিক ভাবধারা বজায় রাখার স্বাধীনতা এরা পেয়েছে। তাই ভারত-সমাজ আর্যগ্রন্থিতে বিভিন্ন ভাবধারার সমন্বয়, unity in diversity। ভারত-সমাজের এই রূপটাকে

* শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর Sources of Law and Society in Ancient India গ্রন্থে এ বিষয় নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের এ বিষয়ে মতামত কি।

বুঝতে অনেক বিদেশীরই কষ্ট হয়। অনেক বিদেশী ঐতিহাসিক এখানেই ইতিহাসের মূল সূত্র হারিয়েছেন।

যাই হোক, এই 'সদাচার' যখন ধর্ম হয়ে দাঁড়াল, তখন সতীপ্রথা যেটা নেহাতই একটা অদ্ভুত ভোগ-লালসার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেটাও হল ধর্মের অঙ্গ। শুধু সতীপ্রথা নয়, কুসংস্কারের একটা স্রোত বয়ে গেছে আমাদের ধর্মের মধ্যে এই সদাচারের মাধ্যমে। এই সদাচার এত প্রবল যে বিচারক Colvin, The Collector of Madura vs. Mutu Ramlingam—যা Ramnad case বলে প্রসিদ্ধ—মামলাটির নিষ্পত্তি করার সময়ে তাঁর রায়ের মধ্যে সামাজিক আচারকে অতি উচ্চে স্থান দিয়েছেন। আজও সমাজে আমরা এই সদাচারের চাপে অস্থির।

একজন বিখ্যাত আইনতত্ত্ববিদ্ custom বা আচারকে মেঠো-পথের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মাঠের মাঝে পায়ে চলার পথ কার দ্বারা কখন কিভাবে তৈরি হল কেউই বলতে পারে না। অনেকদিন মানুষ চলতে চলতে দেখতে পায় সুন্দর একটা আঁকা-বাঁকা পথ হয়ে গেছে। তখন সেইটাই প্রকৃত পথ, অন্য জায়গায় পথ নেই। এমনি করে আচারের সৃষ্টি যা সময়ে সময়ে আইনের উর্ধ্বেও আসন পেতে বসে। এমনি করেই একদিন সমাজে এল নারীহননের প্রথা। এর মূলে একটা উদ্দেশ্য ছিল, উদ্দেশ্যটা যতই হীন হোক। সে উদ্দেশ্য আগেই আলোচনা করেছি। কিন্তু তারপর উদ্দেশ্যটা পিছনে ফেলে এটি একটি শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় প্রথায় পরিণত হয়। আর যখন একবার এটা ধর্মীয় প্রথা হয়ে দাঁড়াল তখন সমাজের গলায় এ তার নাগপাশ পরিয়ে দিল। তবে এটা সত্য যে এর মূলে patriarchal বা পিতৃকেন্দ্রিক সমাজের প্রভাব। গোড়ার দিকে এটাই কাজ করেছে, পরে এর বাহিরের রূপটা বদলে গেছে।

কেউ কেউ মনে করেন যে এর মূলে রয়েছে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রগাঢ়-ভক্তির প্রভাব এবং সেই ভক্তির বহিঃপ্রকাশের এটা একটা অভিব্যক্তি মাত্র এ যুক্তির সমর্থনে তাঁরা দেখান যে ফিজি দ্বীপের উপজাতিদের মধ্যে প্রায়ই স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী সহমরণে যেত স্ব-ইচ্ছায়; ভারতবর্ষে বিধবা চিতায় আরোহণ করে স্বহস্তে চিতায় আগুন দিত এবং চীনে বহুক্ষেত্রে বিধবা আত্মহত্যা করত। এগুলি কিন্তু বিধবা কতটা স্ব-ইচ্ছায় করত, সেটা ভাববার বিষয়। ধর্ম বা সমাজের নাগপাশ বিধবার গলায় এমন চেপে

বসত যে অনেক ক্ষেত্রেই এ না করে তার উপায় থাকত না। Abbe Dubois তাঁর Hindu Manners, Customs and Ceremonies (Oxford, ১৯৫৩, পৃ ৩৬১-৬৪) গ্রন্থে ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে তাঞ্জোর জেলার পুদুপেট্ট গ্রামে একটি সতীদাহের কথা লিখে গেছেন। বিধবাটি প্রথমে সহ-মরণে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। চতুর্দিকে ধন্য ধন্য রব। তারপরের বর্ণনাটা বোঝাবার জন্য তাঁর লেখা থেকেই উদ্ধৃত করছি :

At length, the purohita Brahmin gave the fatal signal. The poor widow was instantly divested of all her jewels, and dragged, more dead than alive, to the pyre. There she was obliged, according to custom, to walk three times round the pile, two of her nearest relatives supporting her by the arms. She accomplished the first round with tottering steps; during the second her strength wholly forsook her and she fainted away in the arms of her conductors, who were obliged to complete the ceremony by dragging her through the third round. Then, at last, senseless and unconscious, she was cast upon the corpse of her husband. At that moment the air resounded with noisy acclamations. The Brahmins, employing the contents of their vessels on the dry wood, applied their torches, and in the twinkling of an eye the whole pile was ablaze. Three times was the unfortunate woman called by her name. But, alas! she made no answer. (পৃ: ৩৬৩-৬৪)

এরকম অনেক ঘটনার স্বাক্ষরই ইতিহাস রেখে গেছে। প্রথমে দুর্ভাগা বিধবা সমাজের চাপে সহমরণের ইচ্ছা প্রকাশ করত; পরে মৃত্যু তার উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হত। তার বুদ্ধিকে বিকৃত করবার জন্য তাকে একটা পানীয় খাওয়ান হোত, যার ফলে সে নিজেই মরণ কামনা করত। Abbe Dubois তাঁর পুস্তকে এরকম পানীয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন :

Several travellers have said, and I am inclined to believe it, that they force upon these wretched victims of superstition a kind of drink, which confuses the mind and prevents them from forming a correct notion of the

dreadful torture to which they are being led. This beverage, they say, consists of a decoction of saffron. It is known that dried saffron pistils (Crocus Sativas), taken in large quantities, cause violent and convulsive laughter, sometimes terminating in death.

কাজেই যাঁরা সহমরণটাকে স্বামীর প্রতি একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে দেখেন, তাঁদের দৃষ্টি একটু একপেশে।

ইতিহাসের পটভূমিকায় এই নিদারুণ প্রথাটি পর্যালোচনা করলে আমরা এর দুটো দিক দেখতে পাই। কোনও কোনও সমাজে, যেমন চীনে, এতে অংশগ্রহণ করতেন সাধারণত রাণীরা অথবা বিশেষ ধনীর বা দলপতির বিধবারা; কোনও কোনও দেশে সাধারণ ঘরের বিধবারাও। চীনের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে সপ্তদশ খ্রীস্টাব্দ অবধি এ প্রথা সেখানে প্রচলিত ছিল। সম্ভবত রাজা সুংচি (১৬৪৪-৬১)-র সময়ের পর এ প্রথার বিলোপ সাধন করা হয়। ঠিক কবে হয় তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। মিশরের পিরামিডের মধ্যে রাজাদের সঙ্গে রাণীদের শায়িত করা হত কিনা, বলা শক্ত, তবে রাণীর প্রতীক সঙ্গে দেওয়া হত। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার বিধবা সহমরণে যেতে বাধ্য হত Bulgarianদের মধ্যে, Slavদের মধ্যে এবং আফ্রিকার Bantu প্রভৃতি উপজাতিদের মধ্যে। প্রাচীন Celtদের মধ্যেও এ প্রথার প্রচলন ছিল। Gaul, Greek এবং Irish জাতির প্রাচীন ইতিহাসে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব জায়গাতেই প্রথাটাকে ধর্মের একটা অঙ্গ বলে গণ্য করা হত। কোনও কোনও দেশে আবার একটা অদ্ভুত নিয়ম প্রচলিত ছিল। যেমন, কোন অবিবাহিত যুবক মারা গেলে তার বাগ্‌দত্তা যুবতীকে এবং কেউ বাগ্‌দত্তা না থাকলে অন্য কোনও একটি যুবতীকে তার সঙ্গে চিতায় তুলে দেওয়া হত। আরব পরিব্রাজক Iban Fadhian ৯২১ অব্দে Volga নদীর ধারে Bulgarianদের মধ্যে এইরকম একটি প্রথা লক্ষ্য করেছিলেন। একজন নেতৃস্থানীয় যুবকের মৃত্যুর পর একটি যুবতীকে এনে ঐ যুবকের মৃতদেহের সঙ্গে তার বিবাহ-ক্রিয়া ধর্মীয় প্রথা অনুসারে সম্পন্ন করা হয় এবং পরে ঐ যুবকের চিতায় যুবতীটিকে তুলে দেওয়া হল। পাছে মৃত ঐ যুবকের আত্মা পরপারে গিয়ে নিঃসঙ্গ বোধ করে, তাই ঐ যুবতীর বলি। নারীর উপর পুরুষের যে শাশ্বত

প্রভুত্ব, নারী পুরুষের ভোগের বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়, এটি হল তার একটা নিকৃষ্টতম জলন্ত নিদর্শন।

বিদেশের কথা ছেড়ে এবার আমাদের নিজের দেশের ইতিহাসে আসা যাক। পূর্বেই আমরা দেখেছি যে Schrader অনুমান করেন, সতীদাহ একটি প্রাচীন আর্য প্রথা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আর্যদের প্রাচীনতম শাখা Indo-Iranianদের গ্রন্থে, অর্থাৎ ঋগ্বেদ বা আবেস্তাতে, আমরা এ প্রথার কোনও উল্লেখ পাই না। সম্ভবত এই দলভুক্ত আর্যরা অন্য আর্য অপেক্ষা আরও সভ্য ছিলেন এবং এই নিষ্ঠুর প্রথাকে তাঁরা ঘৃণা করতেন। অথর্ববেদের মধ্যে আমরা এই প্রথার একটা ছায়া বিবরণ পাই। স্বামীর চিতা সাজান হয়েছে। মৃতদেহ তার উপর শায়িত। বিধবা গিয়ে তার পার্শ্বে শয়ন করলেন। তখন আর একজন এসে সেই বিধবার হাত ধরে বললেন, 'তুমি মৃতের পাশে শুয়ে আছ কেন? ও তো প্রেতলোকে গমন করবে। ওঠ, আমার সঙ্গে চল। আমার সঙ্গে ধর্ম পালন করবে।' (অথর্ববেদ ১৮, ২, ১)

এই পটভূমিকায় আমরা পর্যালোচনা করতে পারি আমাদের সুপ্রাচীন গৃহ্যসূত্রসমূহ। এসব পুস্তকে কোথায়ও সতীদাহের উল্লেখ নেই। আমরা এখানে দেখতে পাই, চিতার উপরে শায়িতা বিধবাকে তার দেবর ধর্মপালন এবং সুতোৎপত্তির উদ্দেশ্যে হাত ধরে তুলে আনত। এই থেকেই আমাদের সমাজে এল 'নিয়োগ' প্রথার প্রচলন; প্রচলিত হল বিধবা বৌদিকে দেবরের বিবাহ করার প্রথা। প্রাচীন পালি সাহিত্যে বা ধর্মশাস্ত্রে সতীদাহের উল্লেখ কোথাও নেই। এমনকি মনুসংহিতাতেও নয়। মহাভারতের মধ্যে আমরা এর উল্লেখ পাই। কিন্তু মহাভারতের অন্তর্গত এই সব উপাখ্যান ঠিক কোন যুগে রচিত তা বলা কঠিন। মহাভারত-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় সুপণ্ডিত Hopkins মনে করেন যে এই বিরাট গ্রন্থ রচনার কাল খ্রীস্টপূর্ব ৪০০ অব্দ থেকে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং মহাভারতের মালমশলাকে ইতিহাসের কাজে লাগাতে গেলে অনেক সময়েই chronology বা কালানুক্রমের বিভ্রাট ঘটে। অন্যদিকে বলা হয়ে থাকে ইতিহাসের সূর্য এবং চন্দ্র হল স্থান (place) এবং কাল (chronology)।

মহামতি আলেকজাণ্ডার যখন এদেশে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের অনেকেই এদেশ সম্বন্ধে প্রচুর নূতন তথ্য সংগ্রহ করে

নিয়ে যান। তার উপর ভিত্তি করে এবং পরবর্তী যুগের আরও অনেক নূতন তথ্য নিয়ে কতকগুলি ইতিহাস রচিত হয়। এইসব সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে পাঞ্জাবে কোনও কোনও ক্ষত্রিয় পরিবারে সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। Diodorus Siculus আলেকজাণ্ডারের ভারতবিজয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন '……he invaded the country of the Kathaians, a people among whom the custom prevailed that widows should be burned along with their husbands, the barbarians having put in force a decree to this effect because an instance had occured of a wife procuring her husband's death by poison.' এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে যে এটা ঠিক সতীদাহ নয়। অসতী স্ত্রীদের দমন করবার জন্যে আইনের কঠোর নির্দেশ। Kathaianরা বাস করত সম্ভবত গুরুদাসপুর জেলায় অমৃতসরের কাছাকাছি কোন স্থানে।

আমরা Diodorusএর লেখা থেকে আর একটি বিবরণী পাই। খ্রীঃ পূঃ ৩২৬ অব্দে ভারতের সেনাপতি Keteus নিহত হন Antigonusএর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে। এই সেনাপতির স্ত্রী সতী হলেন এবং স্বামীর সঙ্গে সহমরণে ইহলোক ত্যাগ করলেন। বিবরণটির McCrindle যে অনুবাদ দিয়েছেন সেটি উদ্ধৃত করলুম :

For although by the law only one was to be burned with the hussand, yet at the funeral of Keteus each of the wives strove for the honour of dying with him, as if this were the noblest crown of virtue. When the matter was brought to the generals for decision, the younger wife represented that the other was pregnant and could not therefore take advantage of the law. The elder pleaded that she was before the other in years, she should be preferred before her in honour also; for in every other case it was the rule that more honour and respect should be accorded to the elder than to the younger. The generals being informed by the midwives that the elder was with child decided in favour of the younger (who)……overjoyed at her victory, set forth for the funeral pile…….

Diodorus-এর সমগ্র বিবরণীর অনুক্রম পাঠ করলে দেখা যায় যে এ

প্রথার সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই, এবং ঐ সেনাপতির দেশে এ নিয়মটি চালু করা হয়েছিল স্বামীহত্যাকারিণী'দের দণ্ড হিসাবে। পরে এটি একটি সামাজিক প্রথায় প্রবর্তিত হয়। সেনাপতির সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা সমাজের চোখে বরণীয়া হতে চেয়েছিলেন, ধর্মের চোখে নয়; অবশ্য এখানে ধর্ম শব্দটি যদি religion অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এ গল্পটি আমাদের আরও একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পাণ্ডু যখন মারা যান তখন কুন্তী এবং মাদ্রীর মধ্যে অনুরূপ একটা যুক্তিতর্ক চলে। দুটি বর্ণনার মধ্যে যা তফাৎ সেটুকু মহাভারতের আদর্শবাদের জন্য। এখানে ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমাদের কতকগুলি বিষয় অবশ্য মনে রাখতে হবে:

১. ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, মাদ্রী তাঁর স্বামীর মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন।

২. মাদ্রী ছিলেন পশ্চিম পাঞ্জাবের মেয়ে, যেখানে এইরকম সহমরণ প্রথার প্রচলন ছিল। মদ্রদেশের রাজধানী ছিল শাকল, আধুনিক শিয়ালকোট।

৩. মহাভারতের আদিপর্বের অনেকখানিই পরবর্তী যুগের লেখা।

এইসব বিষয় যদি আমরা বিবেচনা করি, তাহলে হয়ত এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হবে যে Keteusএর স্ত্রীদের ছবি, কুন্তী এবং মাদ্রীর আলেখ্য যিনি রচনা করেছেন তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, যদিও এর সোজা প্রমাণ খুঁজে বার করা শক্ত, বিশেষ করে মহাভারত যখন ধর্মকে এর মধ্যে টেনে এনেছে: যাই হোক, মহাভারতের গল্পটার দিকে একটু ফিরে তাকাই।

পাণ্ডুরাজার উপর অভিশাপ ছিল যে তিনি নারী-সংসর্গ করতে গেলে তাঁর মৃত্যু হবে। একবার তিনি মাদ্রীর রূপে এমনি আত্মহারা হন যে তাঁর সংযমে ব্যর্থতা আসে এবং তাঁর মৃত্যু হয়। তখন কুন্তী এবং মাদ্রীর মধ্যে কথোপকথন কে সহ-মরণে যাবেন:

কুন্ত্যুবাচ

অহং জ্যেষ্ঠা ধর্মপত্নী জ্যেষ্ঠং ধর্মফলং মম।
অবশ্যংভাবিনো ভাবাস্মা মাং মাদ্রি নিবর্তয়॥

অন্বিষ্যামহি ভর্তারমহং প্রেতবশং গতম্।
উত্তিষ্ঠ ত্বং বিসৃজ্যৈনমিমান্‌পালয় দারকান্

মাদ্র্যুবাচ

অহমেবানুযাস্যামি ভর্তারমপলায়িনম্।
নহি তৃপ্তাস্মি কামানাং জ্যেষ্ঠা মামনুমন্যতাম্॥
মাং চাভিগম্য ক্ষীণোঽয়ং কামাত্তরতসত্তমঃ।
তমুচ্ছিন্দ্যামস্য কামং কথং নু যমসাদনে॥
ন চাপ্যহং বর্তয়ন্তী নির্বিশেষং সুতেষু তে।
বৃত্তিমার্যে চরিষ্যামি স্পৃশেদেনস্তথা চ মাম্॥
তস্মান্মে সুতয়োঃ কুন্তি বর্তিতব্যং স্বপুত্রবৎ।
মাং চ কাময়মানোঽয়ং রাজা প্রেতবশং গতঃ॥
রাজ্ঞঃ শরীরেণ সহ মমাপীদং কলেবরম্।
দগ্ধব্যং সুপ্রতিচ্ছন্নমেতদার্যে প্রিয়ং কুরু॥
দারকেষ্বপ্রমত্তা চ ভবেথাশ্চ হিতা মম।
অতোঽন্যন্ন প্রপশ্যামি সংদেষ্টব্যং হি কিংচন॥

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইত্যুক্ত্বা তং চিতাগ্নিস্থং ধর্মপত্নী নরর্ষভম্।
মদ্ররাজসুতা তূর্ণমন্বারোহদ্যশস্বিনী॥

(আদিপর্ব, ১২৫. ২৩-৩১)

উপরের বিবরণীর মধ্যে আরও একটা জিনিস লক্ষ্যণীয়। পরলোকেও স্বামী তার স্ত্রীকে সম্ভোগ করবে। যাই হোক, এটা পরের যুগে লেখা। খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পাঞ্জাব ছাড়া অন্য কোথায়ও সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ নেই। মহাভারতে এবং রামায়ণে যে কয়টি এইরকম সতীপ্রথার উল্লেখ আছে, পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন, সেগুলি সবই প্রক্ষিপ্ত।

মনুর মধ্যে সতীপ্রথার কোনও উল্লেখ নেই, এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। Buhler প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন যে মনুসংহিতা আনুমানিক ২০০ অব্দে লেখা হয়েছিল। তখনও পর্যন্ত সম্ভবত এটা ধর্মীয় কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায় নি। মনু বোধহয় এটাকে অবৈদিক বলেই গণ্য করেছিলেন।

মনুসংহিতা রচনার তিনশত বৎসরের মধ্যেই সতীপ্রথা ধীরে ধীরে তার শিকড় সমাজের স্তরে স্তরে চালিয়ে দিতে থাকে। ৫১০ অব্দের এরণ (Eran) লিপিতে আমরা এর উল্লেখ পাই। মহারাজ ভানুগুপ্তর সঙ্গে তাঁর সেনাপতি গোপরাজ যুদ্ধে গিয়ে প্রাণ হারালেন। তখন তাঁর স্ত্রী সহমরণে তাঁর অনুগামিনী হলেন। শিলালিপিতে এই বোধহয় সতীপ্রথার প্রথম নিদর্শন। যাই হোক ২০০ অব্দ থেকে ৫১০ অব্দের মধ্যে যে সমস্ত সংস্কৃত কাব্য লেখা হয় তার মধ্যে কিছু কিছু আমরা এ প্রথার উল্লেখ পাই। সেগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা না হলেও, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় ধীরে ধীরে এ প্রথার বিস্তার। হঠাৎ কি কারণে এটা ক্রমশ ব্যাপকতর হতে লাগল তা নির্ণয় করা শক্ত। এর একটা কারণ অবশ্য বিধবাদের বিবাহ সমাজে বন্ধ হওয়া। দেবররা তাদের বৌদিকে বিয়ে করে হয়ত সুখী হত না। তাদের নিজেদের স্ত্রীরা এই বৌদি সতীনকে ঘিরে অশান্তি সৃষ্টি করত এবং সতীন কাঁটার যন্ত্রণা ভোগ করত। এর ফলেই হয়ত বিধবাদের বিবাহ বন্ধ হয়ে যায়। মনু বিধবা বিবাহে কিছুতেই মত দেন নি। আমরা দেখি মনুসংহিতার সময়ের পরই এই সতীদাহের বৃদ্ধি। বিষ্ণুস্মৃতিতে সতীদাহ প্রথার উল্লেখ রয়েছে মাত্র, প্রথাটাকে চালু করবার কোনও চেষ্টাই নেই। বরঞ্চ বলা হয়েছে, স্বামীর মৃত্যুর পর সৎজীবনযাপন এবং ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা বিধবা স্বর্গে স্বামীর পাশে তার স্থান করে নিতে পারে। বিষ্ণুস্মৃতিতে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী এবং তার পুনর্বিবাহ সিদ্ধ এরও নির্দেশ রয়েছে।

বিষ্ণুস্মৃতি লেখা খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকে, অর্থাৎ মনুসংহিতার অন্তত দু'শ বৎসর আগে। তাহলে জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম। বিধবা তার স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হয়ে আবার বিবাহ করতে পারত। যদি সে বাইরের কোনও লোককে বিবাহ করে, তাহলে পরিবারের সম্পত্তির এক অংশ চলে যায় অন্য লোকের হাতে; যদি দেবরকে বিবাহ করে, দেবরের জীবনটা বিষময় হয়ে ওঠে। এই দেখেই সম্ভবত মনু বিধবার পুনর্বিবাহ নিষেধ করলেন এবং সম্পত্তিতে কোন অধিকার দিলেন না (১০,১৮৫-৭)। এর ফল হল, বিধবা সংসারে একটা জঞ্জাল এবং ভারস্বরূপ। তখন তার একমাত্র সম্মানজনক পথ হল নিজেকে স্বামীর চিতায় বিসর্জন দেওয়া। অধ্যাপক অনন্ত সদাশিব আলটেকর তাঁর The Position of Women in Hindu

Civilization (Delhi, ১৯৬২, পৃঃ ১২৫) গ্রন্থে এই সতীপ্রথার পিছনে আরও দুটি কারণ নির্ণয় করেছেন। এ সময়ে ধর্মের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন একটা আদর্শ হয়ে দাঁড়াল এবং বিধবার স্বামীর চিতায় দগ্ধ হওয়াটা এই কৃচ্ছ্রসাধনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে সমাজে বিবেচিত হতে লাগল। এই আদর্শের বশবর্ত্তী হয়েই বিধবারা নিজেদের বলি দিতে থাকেন। দ্বিতীয়ত, কর্মবাদ দর্শনের একটা নূতন ব্যাখ্যা করা হয়। স্বামীর চিতায় যে বিধবা প্রাণ দেবে, তাকে আর এ জগতে ফিরতে হবে না, তার সমস্ত কর্ম ক্ষয় হয়ে অনন্ত স্বর্গলাভ। এ আগুনে তার এবং তার স্বামীর সব পাপ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যতই আদর্শের কথা বলা হোক, যতই মহৎ শাস্ত্র ও দর্শন প্রচার করা হোক, এর মধ্যে যে বেশ খানিকটা বলপ্রয়োগ থাকত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। Abbe Duboi-এর বর্ণনা থেকে এটা বেশ বুঝতে পারা যায়। এটা আরও পরিষ্কার হয় E. Thomson-এর লেখা The Suttee (London, ১৯২৮) গ্রন্থ পাঠ করলে।

আদর্শবাদ, ধর্মের প্রভাব, বলপ্রয়োগ যাই হোক, ক্রমশই এ প্রথাটা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পরবর্তীযুগের ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে এ প্রথার জয়গান আমরা দেখতে পাই। সব চেয়ে আশ্চর্য হই যখন আমরা কল্হনের রাজতরঙ্গিনীর পৃষ্ঠায় "সতীদাহের" ছবি দেখি। কাশ্মীরের এই ঐতিহাসিক যে সব রাণীদের চরিত্রে ঘনতম মসী লেপন করেছেন, সেই সব চরিত্রবতীরা স্বামীর চিতায় আরোহণ করে সোজা স্বর্গে চলে যেতেন। এ সব রাণীরা কেন, অনেক ক্ষেত্রে রাজার রক্ষিতারাও এইভাবে নিজেদের সতী প্রমাণিত করতেন। ধর্মের নামে একটা সংস্কার যখন কুসংস্কারে পরিণত হয়, তখন সেটা কত শ্রীহীন, অমূলক এবং অসত্য, এইসব উদাহরণগুলি তা প্রমাণ করিয়ে দেয়। শিবের অপমানের পুর্বে সতী যদি কোনদিন জানতে পারতেন যে তাঁর নাম নিয়ে পরবর্ত্তী যুগে কত অনাচারের সৃষ্টি হবে, তাহলে বোধহয় তিনি জীবিতাই থাকতেন, দেহত্যাগ করতেন না। সর্বস্তরে সর্বযুগে কুসংস্কারের এই মহিমা। এ সত্যকে করে ধর্মচ্যুত এবং অসত্যকে বসায় ধর্মের সিংহাসনে।

ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর এ প্রথাটা খুবই ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমান নবাবরা এই জঘন্য প্রথা দেখে বিরক্তি প্রকাশ করতেন কিন্তু প্রথম প্রথম সোজাসুজি হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতেন। বাংলা, রাজস্থান এবং বিজয়নগর রাজ্যে এ প্রথা সমধিক প্রচলিত ছিল। এই ছড়িয়ে

পড়ার পেছনে এ সময়ে নূতন করে কোন কারণ ঘটেছিল কিনা তা নির্ণয় করা শক্ত হলেও এটা বোঝা যায় যে, রঘুনন্দন ও তাঁর অনুগামী স্মার্তকারদের বিধানে বিধবার জীবন যখন বেড়াজালে ঘিরে ফেলা হল, তখন অনেকেই হয়ত বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকেই বেশি বরণীয় মনে করত। এর সঙ্গে ছিল সমাজের চাপ এবং আত্মীয়স্বজনের প্ররোচনা।

মুসলমান সম্রাটদের মধ্যে আকবর এবং জাহাঙ্গীর এ প্রথা নিবারণের জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়াসী হয়েছিলেন। আকবর একদল কর্মচারীকে নিয়োগ করলেন দেখবার জন্য যে বিধবাদের উপর এ উদ্দেশ্যে কেউ যেন কোনরকম চাপ না দেয়। এর ফলে দিল্লী এবং আগ্রার সন্নিকটবর্তী স্থানগুলিতে সতীপ্রথা অনেকটা কমে যায়। কিন্তু তাহলেও 'আকবরনামা' থেকে আমরা জানতে পারি যে সম্রাটের কর্মচারী জয়মলের পুত্র তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মাকে জোর করে পিতার চিতায় তুলে দেবার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত সম্রাটের বাধাদানের ফলে রমণীর জীবন রক্ষা পায়। অধ্যাপক সদাশিব আলটেকর মধ্যযুগের কয়েকজন বিদেশী পর্যটকের বিবরণী আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। Manucci লিখে গেছেন যে ক্ষত্রিয় রমণীদের জোর করে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হত। একবার তিনি এরকম একটি রমণীকে উদ্ধার করেন এবং তাঁর একজন ইউরোপীয় বন্ধু সেই বিধবাকে বিবাহ করেন। Bernier একটি অতি করুণ ছবি এঁকে গেছেন। লাহোরে বার বছর বয়সের একটি বিধবা মেয়েকে জোর করে তার স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হয়। অধ্যাপক আলটেকর আর একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। যদি কোন বিধবা তার স্বামীর চিতা থেকে পালিয়ে যেত তাকে আর সমাজ গ্রহণ করত না। নিজের সংসারে সে তার স্থান হারাত। এর ফলে তাকে জঘন্য জীবনের আশ্রয় নিতে হত। এইজন্য যখন সতীদাহ হত তখন নীচজাতির লোকেরা দলে দলে সেই শ্মশানে এসে হাজির হত। এরকম কোনও যুবতীকে পেলে তারা সাদরে ঘরে নিয়ে যেত এবং নূতন করে সংসার পাতত। আমরা আজ এসব ভেবে শিউরে উঠলেও সে যুগের ধর্মকে এইভাবেই রক্ষা করা হত। আকবর এবং জাহাঙ্গীরের চেষ্টা সত্ত্বেও এ প্রথা চলতে থাকে এবং শিখদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে।

১৫১০ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগালের বড়লাট Albuquerque গোয়াতে সতীপ্রথা বে-আইনী বলে ঘোষণা করেন। শেষ মারাঠা পেশোয়া বাজীরাও এ প্রথার

বিরুদ্ধে কিছুটা সংগ্রাম চালিয়েছিলেন কিন্তু মহারাষ্ট্রবাসীদের মধ্যে এ প্রথার প্রচলন খুব বেশি ছিল না। তাঁকে তাই এ নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতে হয় নি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর বৃটিশ শাসকদের স্বভাবতই এই জঘন্য প্রথার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বৃটিশ কর্মচারীগণ এ প্রথা দেখে শিউরে উঠতেন কিন্তু সোজাসুজি হস্তক্ষেপ করতে সাহস করতেন না, পাছে হিন্দুদের ধর্মে আঘাত লাগে। Warren Hastings বিশেষ হতাশ হয়ে একবার পণ্ডিতদের মত জানতে চান। কিন্তু পণ্ডিতরা এ প্রথার স্বপক্ষে মত দেবার পর তিনি তাঁর চেষ্টা পরিত্যাগ করেন। মধ্যে মধ্যে কড়া যে সব ম্যাজিস্ট্রেট আসতেন তাঁরা কোন মতের পরোয়া না করেই তাঁদের এলাকার মধ্যে সতীদাহ বন্ধ করে দিতেন। শেষে তাঁদের উপর এই নির্দেশ জারী করা হয় যে, তাঁরা যুক্তিতর্কের দ্বারা সতীদাহ নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করবেন, কিন্তু আদেশ দিয়ে যেন বন্ধ না করেন। Welleslyর সময়ে রাজকর্মচারীদের উপর এই নির্দেশ দেওয়া হয় যে যেখানে বিধবাদের উপর বলপ্রয়োগ করা হবে সেখানে তাঁরা হস্তক্ষেপ করতে পারেন।

বৃটিশ শাসকদের যখন এইরকম একটা 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা, তখন মিশনারীরা এর বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করেন কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয় নি। কুসংস্কার একবার চেপে বসলে তাকে তাড়ান যে কত শক্ত ব্যাপার এ সব মিশনারীরাও তা বেশ উপলব্ধি করেছিলেন। Ewert নামে একজন পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট যে বর্ণনা রেখে গেছেন তা থেকে আমরা এ জঘন্য প্রথার খানিকটা আভাস পাই। Sir Percival Griffiths তাঁর The British Impact on India (London, ১৯৫২) গ্রন্থে এই বর্ণনা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন :

It is generally supposed that a Suttee takes place with the free will and consent of the widow, and that she frequently persists in her intention to burn, inspite of the arguments and entreaties of her relations. But there are many reasons for thinking that such an event as a voluntary Suttee very rarely occurs; few widows would think of sacrificing themselves unless overpowered by force or persuasion, very little of either being sufficient to overcome the physical or mental powers of the majority of Hindoo females. A widow, who would turn with natural instinctive horror from the first hint of sharing her

husband's pile, will be at length gradually brought to pronounce a reluctant consent, because, distracted with grief at the event, without one friend to advise or protect her, she is little prepared to oppose the surrounding crowd of hungry Brahmins and interested relations, either by argument or force...In this state of confusion a few hours quickly pass, and the widow is burnt before she has had time even to think on the subject. Should utter indifference for her husband, and superior sense, enable her to preserve her judgement, and to resist the arguments of those about her, it will avail her little—the people will not be disappointed of their show ; and the entire population of a village will turn out to assist in dragging her to the bank of the river and in keeping her down on the pile. Under these circumstances nine out of ten widows are burnt to death. (পৃষ্ঠা ২১৯-২২০)

অন্য ধরনের আবার আর একটি ছবি আমরা দেখিতে পাই Captain Sleemanএর Rambles and Recollections গ্রন্থে। Griffiths তাঁর পুস্তকে এ ছবিটিও তুলে ধরেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর এক বিধবা সতী হতে চান এই সংবাদ পেয়ে Sleeman পাঁচ দিন ধরে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে এ কাজ তাঁর করা উচিত নয়। যাই হোক ইতিমধ্যে স্বামীর দেহ ভস্মীভূত করা হয়ে গেছে, কিন্তু সে রমণী অন্য চিতায় আরোহণ করে তাঁর স্বামীর কাছে যেতে চান। তাঁকে নিরস্ত করা গেল না। যথাসময় তিনি স্নান করে একটি পান মুখে দিলেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের কাঁধে হাত দিয়ে চিতার পার্শ্বে গমন করলেন। তাঁর মুখে একটা শান্তি এবং আনন্দের ভাব ফুটে উঠছিল। চিতার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তিনি উপর দিকে চোখ তুলে বললেন, স্বামী, এরা পাঁচদিন ধরে আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। চিতায় তখন আগুন দেওয়া হল। বিধবা সে আগুনকে প্রদক্ষিণ করে এসে মন্ত্র পাঠ করলেন এবং চিতায় পুষ্প নিক্ষেপ করলেন। ধীরে ধীরে চিতায় উঠে অগ্নিশিখার মধ্যে তিনি চুপবিষ্টা, মুখে কোনও শব্দ নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শেষ।

বিধবাটির পতিভক্তি সত্যই আদর্শস্থানীয়। কিন্তু একটা প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে,—এই যে আত্মবলি এটা কি সুস্থ মনের পরিচায়ক? মতভেদ এ

বিষয়ে অবশ্যম্ভাবী, বিশেষ করে আদর্শবাদী এবং মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে। একটা অপ্রিয় সত্যকে স্বীকার করতেই হবে। ধর্মের নামে মানুষ কত অন্ধ হতে পারে, কত অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নিজে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে, এ ছবিটি সেটা প্রমাণ করিয়ে দেয়। এ সংস্কারের কাছে বিবেক এবং বুদ্ধি দুই লোপ পায়, বিবেকহীন, বুদ্ধিহীন সংস্কার সদাচার হয়ে দাঁড়ায়, আর এই সদাচারকেই ধরা হয় ধর্মের অঙ্গ। ইউরোপের ইতিহাসেও আমরা এই রকম মোহাচ্ছন্ন ছবি দেখতে পাই Crusadeএর মধ্যে। এই উদ্দেশ্যে একবার পাঠান হয় একদল বালককে যাকে বলা হয় Children's Crusade। এদের পিতামাতাই বীরের বেশে সাজিয়ে এদের পাঠিয়ে দিলেন খ্রীস্টানদের পবিত্র ভূমি উদ্ধার করবার জন্য। ধর্মের মোহাগ্নিতে সব কটি প্রাণই বিসর্জিত হয়েছিল। পান মুখে দিয়ে কোন রকম বিকৃত শব্দ না করে স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দেওয়া যত বড মহৎ কাজই হোক এটাকে কি ধর্মের পর্যায়ে ফেলা যায়?

দার্শনিকরা একটা কথা প্রায়ই বলে থাকেন। প্রকৃতির নিয়ম হল, খারাপ জিনিস কিছুদিন অবধি টিকে থাকে, তারপর তাকে বিদায় নিতে হয়। আইনের কেতাবে সতীদাহকে বিদায় নিতে হল Lord William Bentinckএর সময়ে। ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮২৯ সালের ১৭নং আইন ধারা (Regulation) মারফৎ সতীদাহ আইনত অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হল। পণ্ডিতরা কিন্তু এর পূর্বে ঐ প্রচেষ্টাকে বানচাল করবার অনেক চেষ্টাই করেছিলেন। তাঁরা ঋগ্বেদের একটি শ্লোককে বিকৃত করে 'অগ্রে' শব্দটির জায়গায় 'অগ্নে' শব্দটি বসিয়ে দেখাবার চেষ্টা করলেন যে এ প্রথা বেদ-সমর্থিত। বিদেশী শাসকের এতে হাত দেওয়ার কোনও অধিকার নেই। যাই হোক, সব ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সরকার এ আইন পাশ করলেন। পরে অনুরূপ আইন বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে পাশ করা হয়। আইনের দিক দিয়ে অন্তত বৃটিশরাজ আমাদের পরাধীনতার নাগপাশে বাঁধলেও, কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই প্রথা কি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল তা আমরা বুঝি যখন দেখি যে ১৮১৮ সালে তদানীন্তন বাংলাদেশে (অর্থাৎ বাংলা, দক্ষিণ বিহার, উড়িষ্যা এবং উত্তর বিহারের খানিকটা) ৮৩৯ জন সতী হয়েছিলেন। সবাই কি এঁরা স্ব-ইচ্ছায় চিতায় আরোহণ করেছিলেন?

যাই হোক, গোঁড়া সমাজবাদীরা এই আইনের বিরুদ্ধে Privy Councilএ

দরখাস্ত পাঠান। একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে যে এই দরখাস্তে অতিকষ্টে তাঁরা মাত্র ৮০০টি সই জোগাড় করতে পেরেছিলেন। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষ এ প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন। প্রথাটিকে জাগিয়ে রেখেছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন। রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গিয়ে Councilএর সামনে ঐ আইনের স্বপক্ষে তাঁর যুক্তি পেশ করেন। দরখাস্তগুলি নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু এর পরেও Native Stateগুলিতে, বিশেষ করে রাজস্থানে, এ প্রথা কিছুটা চলতে থাকে। ক্রমে ক্রমে বৃটিশ সরকার দেশীয় রাজাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং ধীরে ধীরে এ প্রথার অবসান হয়।

ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে একটা মাদকতা আছে। মুখে আমরা যতই যুক্তিতর্ক দিই, মনে মনে বিশ্বাস করি যে আমাদের স্বর্গের চাবিকাঠি এখানেই। শিক্ষিতরাও ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় পূজা ইত্যাদি দিয়ে থাকেন, যদিও মুখে বলেন যে এটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। এদিকে তাকালে দেখব আমাদের মধ্যে সব সময়ে দুটি মানুষ কাজ করছে। একদিকে তাই গোঁড়ারা সাংখ্য-বেদান্তের বুলি আউড়েছেন, অন্যদিকে স্মৃতির জঞ্জাল বুকে চেপে ধরেছেন। কুমারিলভট্টের লেখা পড়লে বোঝা যায় যে তিনি কত পণ্ডিত, কত উদার এবং আবার কত গোঁড়া। এখনও আইন ফাঁকি দিয়ে দু'এক জায়গায় সতীদাহ হয়। হবেই, এ রোধ করা যাবে না। ভবিষ্যতের দিকে আমরা চেয়ে থাকব ধর্মের ক্ষেত্রে কুসংস্কার উৎপাটনের জন্য। কারণ, এখনও আমরা সংস্কারের দাস, প্রায়ই পাঁজিটা খুলে দেখি।

শিশুবলি

জগতে সন্তানের চেয়ে বেশি প্রিয় বোধহয় মানুষের কাছে আর কিছুই নেই। সাধারণ মানবমনের এইটাই ধর্ম। এই সন্তানকে মানুষ যখন নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ত্যাগ করে, অথবা তার প্রতি হিংস্র আচরণ করে, তখন আমরা তাকে ঘৃণা করি, তাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে গণ্য করতে চাই না। আচ্ছা, এখন যদি কোনও মানুষ ধর্মের জন্য তার নিজের সন্তানকে বলি দেয় বা হত্যা করে, তখন এ সংস্কারকে কোন পর্যায়ে ফেলা যাবে? অথচ যদি আমরা ইতিহাসের পাতার দিকে তাকাই তাহলে দেখব শুধু ভারতে কেন, ভারতের বাইরেও এ প্রথার প্রচলন ছিল। মাতা বা পিতা সন্তানটিকে বলি দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঘরে ফিরলেন, কিন্তু চতুর্দিকে ধন্য ধন্য রব, ধর্ম রক্ষা পেয়েছে। সংস্কার নামতে নামতে কত অধস্তরে পৌছতে পারে এটি তার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

বাংলা দেশে প্রথা ছিল যে বন্ধ্যা-রমণী দেবতার কাছে মানত করতেন তাঁর সন্তানাদি হলে তিনি দেবতার উদ্দেশে প্রথমটিকে দান করবেন। এভাবে প্রথম সন্তানকে গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে বিসর্জন দেওয়া হত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে এ ব্যাপারে কোনও হস্তক্ষেপ করেন নি। পরে আইন করে (Bengal Regulation VI of 1802) এটিকে হত্যা অপরাধ হিসাবে দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ধর্মীয় কুসংস্কারকে আইন দ্বারা একেবারে বন্ধ করা শক্ত। ধীরে ধীরে এ সংস্কারের লোপ হতে থাকে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব আমাদের দেশে পড়ে এবং এই প্রভাব স্থিতিশীল হয়। এই কুসংস্কারের মূলে রয়েছে অন্ধ বিশ্বাস: আমার বৃক্ষের প্রথম ফলটি আমি দেবতাকে উৎসর্গ করব; সেই রকম আমার দেহবৃক্ষের প্রথম ফলটি আমি দেব দেবতাকে। অনেক ক্ষেত্রে আরও একটা জঘন্য কুসংস্কার কাজ করে,—দেবতাকে ঘুষ না দিলে তিনি খুশি হবেন না। এটি আর যাই হোক দেবতার পক্ষে নিশ্চয় অবমাননাকর।

Dalton তাঁর Descriptive Ethnology of Bengal (Calcutta,

1872, p. 289) গ্রন্থে খন্দ আদিবাসীদের সম্বন্ধে ১৮৫৭ সালের একটা ঘটনা উল্লেখ করেছেন :

When a child is born, an astrologer called a Jani or Desauri is summoned and consulted by the parents. If from this test it be predicted that the child is not likely to prove a blessing to its parents, but rather that misfortune may befall them if they attempt to rear it, the living infant is placed in a new earthen pot and removed in the direction of the point of the compass, from which, if the child were spared, evil might be expected, and buried. A foal is sacrificed over the grave.

এখানে অবশ্য জ্যেষ্ঠপুত্রকেই যে এইভাবে বলি দেওয়া হত তা নয়, যে সন্তানটি অমঙ্গলকারী বলে বিবেচিত হত, তাকেই এইভাবে হত্যা করা হত, ধরে নেওয়া হত এটা ধর্মেরই একটা অঙ্গ। সোমদেবের কথাসরিৎসাগর (১৩, ৫৭) গ্রন্থে আমরা একটি উপাখ্যান পাই। এক রাজার একটিমাত্র পুত্র ছিল বলে তিনি বিমর্ষভাবে দিন কাটাতেন, কারণ তিনি একাধিক পুত্রাভিলাষী। পুরোহিতদের শরণাপন্ন হলে তাঁকে তাঁর ঐ পুত্রটিকে দেবতার কাছে বলি দিয়ে তার মাংসে যজ্ঞ করবার নির্দেশ দেওয়া হলো। বলা হলো, এই উপায়ে তাঁর অভিলাষ পূর্ণ হবে। পাঞ্জাবের কোন কোন জায়গায় কন্যাকে হত্যা করা হত এবং বলা হত 'তুমি যাও, তোমার ভাইদের পাঠিয়ে দিও'। দাক্ষিণাত্যের নায়ার জাতির লোকেরা হাম বসন্ত ইত্যাদি নিবারণের জন্য প্রথম সন্তানটিকে দেবীর কাছে বলি দিত।

ভারতের সুপ্রাচীন যুগের কোন নজীর নেই যা থেকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে নবজাত শিশুকে ধর্মের উদ্দেশ্যে হত্যা করা হত। বৈদিক সাহিত্যে মেয়েদের অবহেলা করা, অযত্ন করা এবং এই অযত্নের ফলে মৃত্যু হওয়া নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল না। কিন্তু এ হলো সামাজিক প্রথা, ধর্মের পটভূমিকায় এগুলির কোন স্থানই ছিল না। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে Diodorus Siculus ভারতবর্ষের যে বর্ণনা রেখে গেছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি যে ঝিলাম নদীর পূর্বদিকে Sopeithes রাজার দেশ। সে দেশের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

"...These were governed by laws in the highest degree salutary, for while in other respects their political system

was one to admire, beauty was held among them in the highest estimation. For this reason a discrimination between the children born to them is made at the stage of infancy, when those that are perfect in their limbs and features, and have constitutions which promise a combination of strength and beauty, are allowed to be reared, while those that have any bodily defect are condemned to be destroyed as not worth the rearing." কারণ যাই হোক, আমরা কারণটাকে যতই অবজ্ঞা করি সেটির ধর্মের সঙ্গে কোন যোগ নেই। প্রাচীন গ্রীসের অন্তর্গত স্পার্টাতেও শিশু দুর্বল বা বিকলাঙ্গ হলে তাকে হত্যা করা হত। স্পার্টা ছিল সৈনিকের জাতি। তাই এ প্রথা। এর মধ্যে ধর্মের কিছু নেই।

কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই রকম একটা জঘন্য প্রথা ধর্মের নামে বহু প্রাচীন যুগ থেকেই বহু দেশে চলে আসছে। আজও তার সাক্ষ্য বহন করে ইতিহাস। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন জাতির মধ্যে এ প্রথার প্রবর্তন প্রমাণিত হয় Palestineএ প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য দ্বারা। সেখানকার Canaanite জাতির স্তরে গিয়ে পৌঁছলে প্রত্নতাত্ত্বিকরা দেখতে পান যে কয়েকটি পাত্রের মধ্যে বহু শিশুর হাড় রক্ষিত রয়েছে। এগুলি গৃহের যেখানে যজ্ঞ করা হত, ঠিক তার নীচে প্রোথিত। এইসব পাত্রের সঙ্গে অন্যান্য পাত্রে খাদ্য ইত্যাদিও রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে Canaaniteরা মাতৃদেবীর পূজারী ছিল এবং দেবীর নিকটে তারা তাদের প্রথম সন্তানকে উৎসর্গ করত। বাইবেলের Old Testamentএর মধ্যে এবং প্রাচীন Assyrian লিপিতে আমরা Ammonite জাতির উল্লেখ পাই। এদের ধর্ম সম্বন্ধে যা সামান্য কিছু জানা যায় তা থেকে এটা কিন্তু পরিষ্কার যে এদের উপজাতির মধ্যে Melakim অথবা Melek বলে একজন দেবতা ছিলেন। তাঁর পূজা করা হত প্রথম সন্তান, গাছের প্রথম ফল এবং গাভীর প্রথম শাবক দিয়ে। এইরকম একটা প্রথার ছায়া সম্ভবত Old Testamentএর Abrahamএর উপাখ্যানের মধ্যে রয়েছে। Abraham তাঁর পুত্র Isaacকে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দিতে উদ্যত হন। বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা পাই :

2. "And he (God) said, Take now thy son, thine only

son Issac, whom thou lovest, and get thee into the land of Mo-riah ; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of.

9. "And they came to the place which God had told him of ; and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Issac his son, and laid him on the altar upon the wood.

10. "And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son.

11. "And the Angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham ; and he said, Here am I.

12. "And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou any thing unto him : for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me." (Genesis, 22)

এই গল্পটির মধ্যে সম্ভবত একটি প্রাচীন প্রথা এবং তার উচ্ছেদের ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশে ধর্মার্থে সন্তানকে উৎসর্গ করার নিদর্শন পাওয়া যায়।

আর তথ্য সংগ্রহ না করে এবার কারণ অনুসন্ধান করা যাক। ধর্মের সঙ্গে শিশুহত্যার কিভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হল, তা সত্যই একটা ভাববার বিষয়। বৃক্ষের ফলের ন্যায় দেহবৃক্ষের ফলটি দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়ত এর একটা কারণ হতে পারে। ধর্ম যখন মোহে পরিণত হয়, যুক্তি এবং বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে অন্ধবিশ্বাসের উপর ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়, তখন এইরকম বিসদৃশ ফল হয়ে থাকে। 'বিশ্বাসে মিলয়ে হরি তর্কে বহুদূর' কথাটি যেমন সত্য সেইরকম আবার অন্ধবিশ্বাস, যার মূলে জ্ঞানের কোন অংশই নেই, সেটা বহু ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ায় কুসংস্কার এবং ভয়ানক কুসংস্কার।

এর মূলে খানিকটা চাওয়া-পাওয়ার প্রশ্নও থেকে গেছে, যে কথাটা দিয়ে আমরা এ আলোচনাটা আরম্ভ করেছিলুম। কার্থেজের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই যে রোমানরা যখন তাদের শহরটি আক্রমণ করে এবং সেটি বাঁচান যখন প্রায় কার্থেজবাসীর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়, তখন তারা দুইশত শিশু বলি দিয়ে দেবতার কৃপা ভিক্ষা করে নিজেরা বাঁচবার জন্য।

দেবতা কিন্তু বাঁচালেন না, শিশুরাও গেল, শহরও গেল; গেল সমগ্র কার্থেজ জাতি।

অনেক ক্ষেত্রে, যেমন খোণ্ড এবং বহির্ভারতীয় Australoid জাতিদের বেলায় যখন একটা অজানা ভয় পেয়ে বসে তখন তারা মুক্তি পেতে চায় শিশু বলি দিয়ে। নায়ারদের বেলাতেও তাই। সেই চিরন্তন চাওয়া-পাওয়ার সমস্যা। ভয় আশার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে, তাই মূল্য দিতে হয় একটি শিশুকে তার প্রাণ দিয়ে।

E. Westermarck তাঁর সুবিখ্যাত The Origin and Development of the Moral Ideas (Vol. I. London, 1906) গ্রন্থে শিশু হত্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে এবং কারণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে কোন কোন উপজাতির মধ্যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে শিশুর আত্মা সহজেই একটি নারীর কাছ থেকে আর একটি নারীর গর্ভে চলে যেতে পারে। এইজন্য যদি কোন নারী বন্ধ্যা হয় তা হলে তার নিকটতম কোন বান্ধবীর শিশুপুত্রকে বলি দেওয়ার প্রথা উপজাতিদের মধ্যে আছে। তাদের বিশ্বাস যে ঐ মৃত শিশুর আত্মা বন্ধ্যা নারীর গর্ভে প্রবেশ করে তার শিশু হয়ে জন্মাবে। এখানে আমাদের একটি কাহিনী মনে পড়ে। বলরাম প্রথমে দেবকীর গর্ভে জন্ম নেন কিন্তু পরে ভগবান তাঁকে দেবকীর গর্ভ থেকে নিয়ে রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করিয়ে দেন। তাই তাঁর আর একটি নাম সঙ্কর্ষণ। সম্ভবত এই গল্পটির পশ্চাতে এই ধরনের একটা বিশ্বাস রয়েছে।

পরলোকতত্ত্ব

ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মানুষের পরলোকে বিশ্বাস। আবার এই বিশ্বাস গড়েছে দুটো কল্পলোক—স্বর্গ আর নরক। সাধারণ মানুষের ধারণা যে দেহের মধ্যে থেকে বেরিয়ে গিয়ে অর্থাৎ মৃত্যুর পরে আত্মা বিভিন্ন ভাবে বাস করে। মহাপুরুষদের আত্মা মুক্ত হয়ে পরমব্রহ্মে লীন হয়ে যায়, আর যারা নিম্নস্তরের লোক তাদের বিদেহী আত্মা পুনরায় দেহলাভ না করা পর্যন্ত নানাভাবে ঘুরে বেড়ায় কর্মফল অনুসারে, স্বর্গে অথবা নরকে। এই সমস্ত ব্যাপারটা—যাকে কেন্দ্র করে-আমাদের সাধারণ জীবনের একটা বিরাট অধ্যায় গড়ে উঠেছে—সবটারই ভিত্তি একটা অন্ধবিশ্বাস। এটা একটা প্রচলিত সংস্কারেরই অঙ্গ, যাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থেকে অলীক বলে ধরা যেতে পারে। প্রথমত, আমরা বিশ্বাস করে নিই যে আত্মা বলে একটা জিনিস আছে এবং তার সাময়িক বাস আমাদের দেহের মধ্যে। এই আত্মাই জীবন, আত্মা দেহ ছেড়ে যখন বেরিয়ে যায় তখনই হয় মৃত্যু। দ্বিতীয়ত, আত্মা দেহ থেকে বের হলে, এ জগতে দেহে বাস করলে তার যে কর্ম, তার উপরই তার শ্রেণী নির্ণয় হয়, সে স্বর্গলোক লাভ করবে, না অধঃপতিত হবে। এখানে এসে পড়েছে আর একটা জিনিস, কর্মবাদ। এ থেকে আরও একটা সিদ্ধান্ত আসে। দেহে জন্মাবার পূর্বে তাহলে এ আত্মা পরলোকে বিরাজ করছিল, তা সে স্বর্গ ই হোক আর নরকই হোক। তার সু অথবা কু কর্মের ভোগ শেষ হতে সে এসেছে আবার এই পৃথিবীতে। মুক্ত হয়ে পরমব্রহ্মে লীন না হওয়া পর্যন্ত আত্মাকে ঘুরতে হবে এইভাবে।

সুতরাং আত্মা এবং কর্মফলকে কেন্দ্র করেই আমাদের মধ্যে পরলোক-তত্ত্বের উৎপত্তি। কিন্তু এ তত্ত্ব বা সংস্কার বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন যুগে অদ্ভুত রূপ নিয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা আত্মার অস্তিত্ব একেবারেই স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে আমরা যেটাকে আত্মা বলি সেটা nerveএর বা স্নায়ুমণ্ডলীর অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্প্রতি দুএকজন Para-psychologist আত্মা নিয়ে গবেষণা করেছেন, পূর্বজন্ম এবং পরজন্ম বলে

সত্য কিছু আছে কিনা সে সব তথ্য সংগ্রহ করতে তাঁরা ব্যস্ত। অবশ্য তাঁদের সে চেষ্টা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে বা হবে তা জোর করে বলা শক্ত। এর পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলা যায় না। আজও বৈজ্ঞানিক মাপকাঠিতে আত্মা স্নায়ুমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ। আদিবাসীদের মধ্যে আত্মা সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত আছে তা এই স্নায়ুমণ্ডলকেই কেন্দ্র করে, কারণ তারা বিশ্বাস করে আত্মাই হৃদয় বা heart। আমাদের দেহে স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া নিরূপিত হয় হৃদয় মারফৎ; হৃদয়ের স্পন্দনেই তার বাহ্যিক অভিব্যক্তি। সুতরাং আমরা একথা বলতে পারি যে আজ বৈজ্ঞানিকরা যেকথা বলেছেন, আদিবাসীদের মধ্যে সেই ধারণাই স্থূলরূপে এবং অন্যভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। এই আদিবাসীদের কাছ থেকেই আমাদের মধ্যে এই রকম একটা ধারণা চলে এসেছে। কোনও পুজার সময় আমরা যখন প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি তখন প্রতিমার বক্ষে দূর্বা এবং আতপচাল হাতে করে ধরে প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র পাঠ করি। কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ থেকে এই প্রক্রিয়াটি উদ্ধৃত করছি :

"দেবতার সম্মুখভাগ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া লেলিহান মুদ্রা দ্বারা দেবতার হৃদয়ে দূর্বা এবং আতপতণ্ডুল ধারণ করতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। যথা—

> '............শ্রীঅমুকদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ।......শ্রীঅমুক দেবতায়া জীব ইহ স্থিতঃ।.........শ্রীঅমুকদেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি।.........শ্রীঅমুকদেবতায়া বাঙ্মনস্তক্‌চক্ষুঃ শ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।' "

একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে হৃদয় মারফৎ আমরা দেবতার প্রাণ, জীবন, সমস্ত ইন্দ্রিয়, বাক্, মন, চক্ষু, কর্ণ এবং ঘ্রাণশক্তি সবই প্রতিষ্ঠা করছি। অর্থাৎ হৃদয়ই যে আমাদের জীবনের আধার এটা সেই বিশ্বাসেরই একটা বড় প্রমাণ। Old Testament-এর মধ্যেও আমরা এই রকম একটা ধারণার আভাস পাই।

'And the Lord God formed men of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul.'

(Genesis, II. 7)

এখানে নিঃশ্বাসের প্রক্রিয়াকে বলা হয়েছে আত্মা। নিঃশ্বাসের প্রক্রিয়া

nerve বা স্নায়ুমণ্ডলের ব্যাপার এবং তা নিয়ন্ত্রিত হয় হৃদয় মারফৎ; সুতরাং এখানেও আমরা heart এবং আত্মার একীকরণ দেখতে পাই। আজ heart transplantationএর যুগে এ ধারণাটা নিশ্চয় অনেকের কাছে ধাক্কা খাচ্ছে, এবং আদিবাসীরা যখন ভাল করে এ ব্যাপারটা বুঝবে তাদের বিশ্বাস কি আকার নেবে সেটা বলা শক্ত।

যাই হোক মানুষ সব যুগেই বিশ্বাস করেছে যে মৃত্যুই প্রকৃতপক্ষে আমাদের শেষ নয়। আমাদের মধ্যে যাঁরা জন্মান্তরে বিশ্বাসী, তাঁরা এই বিশ্বাসকেই কেন্দ্র করে কর্মবাদ বা অদৃষ্টবাদের জল্পনা কল্পনা করে থাকেন। চার্বাক মতবাদ ছাড়া ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা গড়ে উঠেছে এই বিশ্বাসকেই কেন্দ্র করে, কোনও বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে ভিত্তি করে নয়। এই মতবাদটা মেনে নিলে স্বভাবতঃই এটা একটা ধর্মের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, যা হয়েছে আমাদের ধর্মে। কর্ম প্রতিজন্মে ফিরে আসে আত্মাকে কেন্দ্র করে, কাজেই যাঁরা শুভ কর্ম করেন তাঁদের হয় স্বর্গে বাস আর যাঁদের কর্ম অশুভ তাঁদের স্থান নরকে। স্বীয় কর্মভোগান্তে দু'দলই আবার ফিরে আসবেন এ জগতে কর্মের দ্বারা আবার যখন আত্মার মুক্তি ঘটবে, তখনই বন্ধ হবে এই যাওয়া আসা। কর্মের মহিমার বা কালিমার ছাপ সব সময়েই আত্মাতে লেগে থাকে। যাঁরা জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করেন না, যেমন ইহুদী বা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা তাঁরাও কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব এবং তাতে জাগতিক কর্মের ছাপের কথা বিশ্বাস করেন, যদিও সব আত্মার বিচার হবে একসঙ্গে এবং শেষদিনে। এই শেষদিনের বিচারের জন্য আত্মাকে কবরের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকতে হবে।

আদিবাসীদের মধ্যে স্বর্গ-নরকের ধারণা সম্বন্ধে খুব একটা সুস্পষ্ট ছবি আমরা পাই না। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এরাও বিশ্বাসী, কিন্তু মরণের পর সে আত্মা কোথায় এবং কেমনভাবে বাস করছে তার ধারণা তাদের বিশেষ নেই। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন আদিবাসীদের মধ্যে একটা ধারণা দেখা যায় যে তারা যে পাথরের টুকরা পূজা করে, মৃতের আত্মা তার মধ্যেই স্থান পায়। মহীশূরের Coorgদের মধ্যে আবার অন্য ধারণা। বিরাট বনভূমি—যেখানের মানুষের কোন পদচিহ্ন নেই—এদের মতে পূর্বপুরুষদের আত্মার সেখানেই বাস। কোন কোন নাগাদের মতে মরণের পর আত্মা গিয়ে বাস করে পাহাড়ে। অন্যদের বিশ্বাস আত্মার স্থান পাথরের টুকরার

মধ্যে; আবার আর একদলের মতে মৃতের আত্মা মাটির নীচে চলে যায়। ঠিক মাটির উপরে যেমন জগত, মাটির নীচেও এইরকম একটা জগত আছে। সেখানে বাসের পর আত্মার দ্বিতীয়বার মৃত্যু ঘটে এবং এই দ্বিতীয় মৃত্যুর পর সে আবার জগতে জন্ম নেয় প্রজাপতি বা কীট রূপে এবং তার পরে যে মৃত্যু সেইখানেই সব শেষ। Gond উপজাতির মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পাঁচদিন পরে এই উপজাতির লোকেরা একটি মাছ বা একটি কীটকে হঠাৎ ধরে ফেলে। তাদের বিশ্বাস মৃত আত্মা পঞ্চমদিনে এইভাবে ধরা দেয়; তখন এটিকে এনে তারা সযত্নে বাড়িতে রেখে দেয়। মোরগ বা টিকটিকি মারফৎ বৎসরে দুবার এরা মৃতের উদ্দেশে আহারাদি ভোজন করায় এবং বিশ্বাস করে যে আত্মা একদিন আবার সেই বংশের ছেলে হয়েই আবির্ভূত হবে। যাদেব বাঘের কবলে প্রাণ যায়, জঙ্গলে এদের মতে বাঘের হাত থেকে তাদের আত্মাই রক্ষা করে।

এইরকম অনেক দৃষ্টান্ত আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়। এসব থেকে একটা জিনিস স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে আমাদের মধ্যে কর্মফলকে কেন্দ্র করে স্বর্গ-নরকের যে ধারণা আছে সেটা ঠিক এদের মধ্যে নেই। এরা আত্মার অস্তিত্বে অবশ্য বিশ্বাস করে এবং ধরে নেয় যে বিদেহী আত্মা বিভিন্নরূপে ঘুরে বেড়ায়। Gondদের উদাহরণ থেকে এটাও বোঝা যায় যে তারা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। কিন্তু আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার অনেক আদি-বাসীর কাছে মৃত্যু মানেই সব শেষ; পুনর্জন্ম বলে কিছুই নেই। অন্যদিকে আবার অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের অনেকে মৃত্যুর পরই সকলে স্বর্গরাজ্যে স্থান পাবে এইরকম বিশ্বাস করে, সে স্বর্গে কেবল সুখ, সুখ আর আনন্দ। পার্থিব কর্মফলের কোনও ছোঁয়াচ সেখানে নেই।

বৈদিক সাহিত্যে আমরা যে পরলোকের সন্ধান পাই, তা হল পিতৃলোক। জগতে সর্বপ্রথম যিনি মৃত্যু বরণ করেন, তিনিই হলেন যম, পিতৃলোকের অধীশ্বর। মৃত্যুর পর মানুষ যায় যমের রাজ্যে। মৃতের আত্মার প্রতি শ্রাদ্ধাদির সময়ে যা দান করা হয়, সেখানে তা তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়; সোম তাদের পানীয় দান করে এবং বিভিন্ন সূত্রে ঘৃত, মধু ইত্যাদি তাদের ভোগার্থে আসে। যারা সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জন দেয়, অথবা ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করে দানাদি কার্য সম্পন্ন করে, তপস্যায় যারা রত, তারাই এই পিতৃলোকে সর্বসুখ ভোগ করে; কিন্তু যারা অসতী, কুকর্মকারী, যজ্ঞের

বিঘ্নকারী. তারা এসব সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। পিতৃলোক পার হয়ে তারপর স্বর্গলোক, কিন্তু ঋগ্বেদের মধ্যে যে ছবিটা পাওয়া যায় সেটা খুব স্পষ্ট নয়। মরণের পর পিতৃলোকে অথবা কুকর্মের ফলে অতলে আঁধারের গর্ভে বাসের পর আত্মার কিভাবে স্বর্গলাভ হয়, তা নির্ণয় করা কঠিন।

পরবর্তী সংহিতা এবং ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে অবশ্য আমরা স্বর্গ এবং নরকের খানিকটা সুস্পষ্ট ছবি পাই। অথর্ববেদের একটা বর্ণনায় আছে যে মৃত্যুর পর আত্মা পরলোক বা স্বর্গে তার স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখে বাস করে এবং এমনকি সে সেখানে প্রচুর যৌন সুখও উপভোগ করে (অথর্ববেদ, ৪, ২৪, ২)। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের চোখে কল্পনায় যে সুখের ছবিটা ভেসে ওঠে তারই ভিত্তিতে সে স্বর্গের ছবি আঁকে। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে একজন এ জগতে যজ্ঞের উদ্দেশে যতটা দান করবে, পরলোকে ততটা কম ভোজন করলেও সে সুখে থাকবে। এইসব ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের মধ্যে নরকেরও একটা ছবি আমরা পাই। কিন্তু তার পাশাপাশি পাই অদ্ভুত একটা পরিকল্পনা। পরলোকে আত্মার বারবার মৃত্যু হয় এবং সেই যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাবার জন্য ইহলোকে দীর্ঘজীবনের কামনা।

স্বর্গ-নরকের প্রথম সুস্পষ্ট ধারণা আমরা দেখতে পাই উপনিষদের মধ্যে। জ্ঞানীরা পরমব্রহ্মে লীন হন, সুকর্মকারীগণ যান চন্দ্রলোকে এবং দুষ্কৃতকারীদের স্থান নরকে। চন্দ্রলোকবাসী বা নরকবাসী কর্মক্ষয়ান্তে পৃথিবীতে ফিরে আসেন, তাঁদের মুক্তি হয় না, মুক্তি হয় কেবল জ্ঞানীদের। ভগবদ্‌গীতার মধ্যেও অনুরূপ একটা ছবি আমরা দেখতে পাই। যাই হোক, চন্দ্রলোকবাসী বা পিতৃলোকবাসী বা প্রেতলোকবাসীদের আত্মার তৃপ্ত্যর্থে ধর্মশাস্ত্রাদিতে নানা বিধানের সৃষ্টি হয়েছে। এসবের উদ্দেশ্য একদিকে যেমন মৃত আত্মার শান্তি, অন্যদিকে তেমনি তাদের আশীর্বাদে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি। যাই হোক; পরবর্তী গ্রন্থসমূহে বেদ এবং উপনিষদের চিন্তাধারার আরও বিশদ এবং বিস্তীর্ণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ক্রমে ক্রমে দাঁড়িয়েছে এক এক ভক্তের জন্য এক একটি স্বর্গ, যেমন বৈকুণ্ঠ বৈষ্ণবের, কৈলাস শৈবের এবং শাক্তদের, ইত্যাদি। নরকের সংখ্যাও তেমনি এক নয় বহু। পুরাণের মধ্যে এই সব বর্ণনাগুলি পাওয়া যায়। পুরাণ লেখা সাধারণ লোকের জন্য, যা থেকে বোঝা যায় যে তখনকার দিনে সাধারণ লোকের মনে এই রকম নানা চিন্তার উদ্ভব

হত। এসবের সুযোগ যে ভট্টাচার্য মহাশয়রা নিতেন না তাও নয়। তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে শ্রাদ্ধ এবং দানাদির বিভিন্ন ব্যবস্থা দিয়েছেন।

এখানে আমরা মহাভারতের মধ্যে বর্ণিত স্বর্গ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে পারি, কারণ এ বর্ণনাগুলি একটু অদ্ভুত রকমের। ভীষ্মপর্বে বলা হয়েছে যে শাকদ্বীপে থাকেন শঙ্কর এবং কুশদ্বীপে স্বয়ং নারায়ণ হরি। শাকদ্বীপ এবং কুশদ্বীপের নদ নদী এবং পর্বতাদির যে বর্ণনা, তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে এটা হল সোভিয়েত দেশ অন্তর্গত মধ্য এশিয়া। আনুমানিক ১৪০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত Ptolemyর ভূগোলে Scythia beyond Indusএর যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে মহাভারতের বর্ণনার প্রচুর মিল আছে। ভীষ্মপর্বেও বলা হয়েছে যে শাকদ্বীপ এবং কুশদ্বীপ ভারতের উত্তরে। দ্বীপ কথাটির অর্থ এখানে লক্ষণীয়। পরবর্তী যুগে দ্বীপ বলতে যা বোঝায়, এ দ্বীপ কিন্তু ঠিক তা নয়। দ্বীপের প্রকৃত অর্থ 'দ্বিরাপত্বাৎ স্মৃতো দ্বীপঃ' অর্থাৎ যার দুধারে জল সেইটাই দ্বীপ। মহাভারতের মধ্যে শাকলদ্বীপের উল্লেখ আছে। শাকল হল পাকিস্তানের অন্তর্গত আধুনিক শিয়ালকোট, দুটি নদীর মাঝখানে। এ থেকে বোঝা যায় যে মধ্য এশিয়ার সির-দরিয়া, আমুদরিয়া প্রভৃতি নদীর মধ্যস্থিত দেশগুলিকেই দ্বীপ বলা হয়েছে। আমরা যে সপ্ত-দ্বীপা বসুমতীর কল্পনা পাই, তার মূলে রয়েছে দ্বীপের এই সংজ্ঞা। পরে যখন দ্বীপের অর্থ অন্যরকমভাবে করা হয়, তখন পুরাণকারীরা সপ্তদ্বীপা বসুমতীর নূতন অর্থ করেন।

যাই হোক, ভীষ্মপর্বের বর্ণনা থেকে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে মধ্য এশিয়াকেই মহাভারতের লেখক স্বর্গরূপে কল্পনা করেছিলেন। এর কি কারণ তা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। হতে পারে যে মধ্য এশিয়া আর্যদের আদিভূমি এবং ভারতে আসার পরেও তাঁদের আদি পিতৃভূমিকেই স্বর্গরূপে তাঁরা কল্পনা করেছেন এবং তারই একটা রেশ আমরা মহাভারতের মধ্যে পাই। অন্য কারণও অবশ্য থাকতে পারে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে, বিশেষ করে কুষাণযুগে, অনেক ভারতীয় মধ্য এশিয়ায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। মধ্য এশিয়ার জলহাওয়া ভাল এবং এখানকার লোকে বাঁচেও অনেকদিন। পরে তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কেউ অবশ্যই ভারতে ফিরে এসেছিলেন এবং তাঁরা যে গল্প করতেন তা থেকেই হয়ত মধ্য এশিয়াকে দেবলোক বলে কল্পনা করা হত। কলম্বাস এবং তাঁর সঙ্গীরা যখন আমেরিকা

আবিষ্কার করে ফিরে আসেন তখন আমেরিকা সম্বন্ধেও এইরকম অনেক গল্প ইউরোপে তাঁরা চালু করেছিলেন।

এ সম্বন্ধে আরও খানিকটা বিস্তৃত চিন্তাধারার নিদর্শন আমরা পাই পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণের বর্ণনার মধ্যে। এই বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে মহাপ্রস্থানিক পর্বে। পাণ্ডবগণ এবং দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানের পথে "উত্তরদিকে গমন করিতে করিতে হিমালয়গিরি দেখিতে পাইলেন। এ পর্বতে আরোহণপুর্বক গমন করিতে করিতে বালুকাময় সমুদ্র ও সুমেরু পর্বত তাঁহাদিগের নেত্রপথে নিপতিত হইল। তখন তাঁহারা হিমালয় অতিক্রম করিবার মানসে দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন।" মহাভারতের এ বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে পাণ্ডবরা স্বর্গারোহণ মানসে হিমালয়ের পরপারে যাচ্ছিলেন। উপরের বর্ণনায় বালুকাময় সমুদ্র Taklamakan অথবা গোবি-মরুভূমি এবং সুমেরু পর্বত যে পামির এ বিষয়ে প্রায় সব পণ্ডিতই একমত। এর পরের বর্ণনায় আমরা পাই দ্রৌপদীসহ যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের একে একে পতন। একা যুধিষ্ঠির তখন ইন্দ্রের রথে উঠে স্বর্গে গেলেন। ঐ বর্ণনায় মধ্য এশিয়াকে স্বর্গ না বললেও মধ্য এশিয়া যে একটা মহাপুণ্য-ভূমি এবং সেখান থেকে স্বর্গে যাওয়া যায় তার একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। আমাদের মধ্যে একটা চলতি প্রবাদ রয়েছে যে হরিদ্বার স্বর্গের প্রথম দ্বার এবং কেদার দ্বিতীয় দ্বার। হয়ত কোনও ভক্ত তাই কল্পনা করেছেন। কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতসারে একটা ঐতিহাসিক তথ্য কি এর পিছনে লুকিয়ে নেই?

মধ্য এশিয়াকে স্বর্গ বলে কল্পনা না করলেও এটি যে একটি দেবলোক এবং এখানে দেবতারা এসে ধার্মিকদের স্বর্গে নিয়ে যান, এ বিশ্বাস অবশ্যই প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধদের কাছেও, বিশেষ করে মহাযান মতাবলম্বীদের কাছে, মধ্য এশিয়া পবিত্র ভূমি বলে গণ্য হত। মনীষী Levi দেখিয়েছেন যে অমিতাভ, মঞ্জুশ্রী, ক্ষিতিগর্ভ প্রভৃতি বোধিসত্ত্বরা প্রথমে মধ্য এশিয়াতেই পুজা পেতেন, পরে এঁদের পুজা ভারতে প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে অবশ্য যে স্বর্গ এবং নরকের বর্ণনা আছে তো বোধহয় ব্রাহ্মণ্য কল্পনাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে। বিভিন্ন স্বর্গের এবং নরকের বিবরণ আমরা পাই। মজ্ঝিমনিকায় এবং দীঘনিকায় গ্রন্থে অনেক স্বর্গের বর্ণনা পাওয়া যায়, আবার জাতক এবং নিকায়াদি পুস্তকের মধ্যে আমরা আটটি প্রধান

এবং তাছাড়া বহু অপ্রধান নরকের কথা পাই। Otto Kirfel তাঁর Die Kosmographie der Inder গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। যেমন হিন্দুধর্মে, তেমনি বৌদ্ধধর্মেও মহানির্বাণ লাভের পূর্ব পর্যন্ত মানুষকে তার কর্মফল অনুসারে হয় একটি কোনও স্বর্গে, না হয় একটি কোনও নরকে বাস করতে হয়। এখানে স্বর্গ ও নরক, আমরা যাকে প্রেতলোক বলি তারই একটা কাল্পনিক বিভাগ। স্বর্গ পৃথিবীর উপরে স্তরে স্তরে বিদ্যমান, নরক ঠিক তেমনি স্তরে স্তরে পৃথিবীর নীচে। এইরকম একটি স্বর্গে বাস করেন ইন্দ্র, যাঁর সঙ্গে বুদ্ধদেব প্রায়ই দেখা করতে যেতেন।

তিব্বতীদের পরলোক কল্পনায় আমরা বৌদ্ধপ্রভাব প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাই। এটা খুবই স্বাভাবিক। বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে প্রসার লাভ করবার পর তাদের জনজীবনের প্রত্যেক স্তরেই আমরা ধর্মীয় প্রভাব লক্ষ্য করি এবং পরলোক কল্পনার মত একটা বিশিষ্ট ব্যাপারে, যা ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, বৌদ্ধধর্মের খানিকটা ছায়া থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রভাবও খানিকটা কাজ করেছে। চীনের প্রাচীন সংস্কৃতি এবং উত্তর এশিয়ার সাধারণ লোকের চিন্তাধারা—দু'এর প্রভাবই এদের উপর দেখতে পাওয়া যায়। Waddell এদের পরলোক ধারণা সম্বন্ধে যা বলেছেন, নিম্নে তা উদ্ধৃত করলুম :

> "The laity and most of the Lamas believe that, at first at any rate, the spirits of all the dead tend to become malignant ghosts, which require propitiation by the surviving relatives, except in the case of a few great saints, like the grand Lamas. whose spirits are supposed to re-incarnate almost immediately. But, in the background, most Tibetans cherish the hope of attaining the western paradise of the blest, the everlasting solar paradise of 'the Buddha of Boundless Light' (Hod-dpag-med or Amitabha), the popular goal of Northern Buddhists generally, just as in Southern Buddhism, in Burma, Siam and Ceylon, the popular goal is not a nirvana or extincton, but Indra's paradise in the sky, whence, they are taught, Buddha Gautama descended to this world and which he frequently revisited. It is mainly with the object

> of gaining merit sufficient to reach this paradise that the Tibetans so assiduously tell their beads mutter so incessantly the mystic Om mani formula, and ply their prayer-wheels, revolving the same printed sentence, which is believed to close the door of hell and be the passport to heaven. The idea of rebirth in human or other form is not a popular one; nearly all concentrate their hopes on reaching paradise. Even nirvana is considered by most Lamas to be not any extinction of existence, but a dreámy existence in a personal paradise outside the circle af rebirths and so infinitely remote that it is unknowable.

উত্তর এশিয়াবাসীদের মত তিব্বতীরাও বিশ্বাস করে যে নরকে সাংঘাতিক রকম হিমপ্রবাহ বিদ্যমান এবং সেখানকার নিদারুণ ঠাণ্ডায় কুকর্মকারীদের আত্মা কষ্টভোগ করে। অন্যদিকে স্বর্গে মনোরম উষ্ণপ্রবাহ যাতে আত্মা পরম সুখে বাস করে। স্বর্গ এবং নরক যে আমাদের সুখ এবং দুঃখের চিত্র বহন করছে এইটাই হল পরলোকতত্ত্বের মোদ্দা কল্পনা। সেখানে আমরা সুখে থাকব, আমাদের এ জীবনের ইন্দ্রিয়ভোগ্য সব জিনিসই সেখানে আমরা লাভ করব, এ জীবনে যা থেকে কষ্ট পাচ্ছি, তার লেশমাত্র সেখানে থাকবে না,—এই হল আমাদের স্বর্গলোক; আর এর বিপরীতটা হল আমাদের নরক। উত্তর এশিয়া এবং তিব্বতে মানুষ শীতের প্রকোপে ভীষণ কষ্ট পায়, শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তারা ক্লান্ত। তাই, স্বভাবতঃই সে দেশের লোকের সামনে নরকের ছবি বহন করে আনে একটি রাজ্য যেখানে আরও শীত এবং শীতের প্রভাবে মানুষ আরও কষ্ট পায়। হয়ত ভীষণ গরমে যারা কষ্ট পাচ্ছে তাদের স্বর্গে বইছে ঠাণ্ডা হাওয়া এবং গরমের ধাক্কা সেখানে মোটেই পৌঁছাচ্ছে না। আমরা গরম এবং ঠাণ্ডা দু'এর প্রচণ্ডতা ভোগ করি; তাই আমাদের চোখে স্বর্গ হল চিরবসন্তময়।

সুখের কল্পলোক রচনা ছাড়াও নানারকম সংস্কার এবং বিশ্বাসকে ভিত্তি করে বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বর্গ এবং নরকের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে বসে আছে। উত্তর ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পুর্বে পরলোক সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত ধারণা প্রচলিত ছিল। সেখানকার মানুষ বিশ্বাস করত যে মৃত্যুর পরে আত্মা ছোট

ঢিবি বা টিলার মধ্যে বাস করে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা কবরের পাশে ছোট ছোট টিলা তৈরী করত। এ বিশ্বাস কোন ধারণাকে কেন্দ্র করে সজীব হয়ে উঠেছিল, তা সঠিক নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে এখন সম্ভব নয়। দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন উপজাতি বিশ্বাস করে যে মৃতের আত্মা প্রথমে জলের নীচে চলে যায়, তারপর সে আত্মাকে কুমীর বা হাঙ্গর ভক্ষণ করে এবং তাদের উদর মারফৎ আত্মার স্থান হয় স্বর্গে বা নরকে। এ স্বর্গ পৃথিবী থেকে অনেক উপরে, আবার কারও মতে সন্ধ্যাবেলায় সূর্য যেখানে অস্ত যায় ঠিক সেইখানে। দুঃখ সেখানে পৌঁছতে পারে না, বন্ধুরা সেখানে প্রতারণা করে না, মানুষ সেখানে শিকারে কৃতকার্য হয়, সেখানকার স্ত্রীলোকেরা সবাই সুন্দরী এবং সাধ্বী। কুমীর-হাঙ্গরের উদর মারফৎ যে কল্পলোকের সৃষ্টি হয়েছে সেখানেও রয়েছে ইহলোকের সব কামনার চরিতার্থতা। উত্তর আমেরিকার Pima জাতির মধ্যেও ঐ সেই একই চাওয়া-পাওয়ার স্বর্গ। পূর্বদিকে যেখানে সূর্যের উদয় সেখানেই স্বর্গ, সেখানে চলছে দিনরাত নাচগান এবং আমোদপ্রমোদ। সেদেশের আর এক উপজাতির মতে এ স্বর্গ হল মাটির তলায়। অস্তগামী সূর্য যখন ধীরে ধীরে মাটির তলায় চলে যায়, আত্মারাও সেই সঙ্গে চলে যায় এই কল্পলোকে যেখানে সুখের রাজত্ব। এসব বিশ্বাসের মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়, পাওয়া যায় না আত্মার হাঙ্গর কুমীরের পেটে যাওয়া বা প্যাঁচা প্রভৃতি বন্যরূপ ধারণ-করার মূলসূত্রটি। এইরকম মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না অনেক আদিম জাতির বিশ্বাসের মধ্যেই।

New Testamentএর Revelation অধ্যায়ে আমরা স্বর্গের যে প্রতিচ্ছবি পাই, তার মধ্যে একদিকে রয়েছে ভক্তি এবং জ্ঞানের সংমিশ্রণ, অন্যদিকে আদর্শ জনজীবনের ছায়াও তাতে প্রবেশ করেছে:

> 'And the nations of them which are saved shall walk in the light of it; and the Kings of the earth do bring their glory and honour into it.
>
> 'And they shall bring the glory and honour of the nations into it.' (21.24.26)

এই অধ্যায়ে আমরা দেখি ঈশ্বরের রাজ্যের ছবি যেখানে ভক্তেরা নিরবিচ্ছিন্ন সুখে বাস করে, অপরদিকে দেখতে পাই কর্মফলে বিশ্বাস। মানবজাতি তাদের গৌরব এবং সম্মান সে জগতে বহন করে নিয়ে যায়।

এদুটো বিশ্বাস আমাদের পুরাণ ইত্যাদির মধ্যে দেখতে পাই, যদিও সেসব স্থলে বর্ণনাগুলো এসেছে অনেক রূপকথার মাধ্যমে। New Testamentএর অনেক জায়গাতে অবশ্য আমরা স্বর্গকে কেন্দ্র করে এরকম ঘটনার অবতারণা দেখতে পাই।

Old Testamentএর মধ্যে আমরা কিন্তু এরকম একটা উজ্জ্বল ছবি দেখতে পাই না, যেখানে ভক্তরা ভগবানের সঙ্গে সুখে বাস করছে অথবা কৃতী এবং কর্মীরা তাদের কাজের সুফল লাভ করছে। Genesisএর মধ্যে আমরা কবর এবং স্বর্গ অথবা নরকের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাই না। যেমন :

> 'All his sons and all his daughters rose up to comfort him ; but he refused to be comforted ; and he said, For I will go down into the grave unto my son mourning. Thus his father wept for him.'
> (Genesis, 37.35)

এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে Genesisএর লেখক কবরকেই শেষ বলে গণ্য করেছেন। অন্যত্র আমরা দেখি যে স্বর্গ উপরে এবং নরক মাটির নীচে :

> 'It is as high as heaven ; what canst thou do ? deeper than hell ; what canst thou know ?
> (Job, 11.8)

> 'The way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath.' (Proverbs, 15.24)
> 'Hell from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming : it stirreth up the dead for thee even all the chief ones of the earth , it hath raised up from their thrones all the kings of the nations.'
> (Isaiah, 14·9)

প্রাচীন গ্রীক এবং রোমানদের মধ্যে পরলোক সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচলিত ছিল, বা এই মতবাদকে কেন্দ্র করে যে দার্শনিক তত্ত্বসমূহের উদ্ভব হয়েছিল, কথায় তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। হোমারের লেখার মধ্যে পাপীরা কি ভয়াবহ নরকে যাবে তার ছবি একটা পাওয়া যায়। অন্যদিকে এম্‌পিডক্লিস

বলেছেন যে ঈশ্বরের সঙ্গ ছেড়ে আত্মা জগতে এসে মুসাফিরের মত ঘুরে বেড়ায়। প্রাচীন গ্রীসে একদল বিশ্বাস করতেন যে প্রথমে সব আত্মাই পবিত্র এবং পাপমুক্ত অবস্থায় জগতে আসে, কর্মের বন্ধনে তারা ঘুরে বেড়ায়। আমাদের উপনিষদের মধ্যেও অনেকটা এই রকম কথাই বলা হয়েছে। পুণ্যাত্মারা সু-জীবন লাভ করেন, আর যারা পাপী তারা পশু, পক্ষী, বৃষ ইত্যাদি হয়ে জন্মায়। শুদ্ধাত্মারাই আবার ভগবানের রাজ্যে ফিরে যেতে পারেন।

ইতালিতে গ্রীক সভ্যতা প্রবেশ করবার পুর্বে সাধারণ ধারণা ছিল যে মৃত আত্মা কবরের মধ্যেই বাস করে। পরবর্তী যুগে গ্রীক প্রভাবে এ মতের অনেকটা পরিবর্তন হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অনেক কবরের মধ্যে মাটির ছোট ছোট বাড়ি এবং বিভিন্ন প্রকারের জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে প্রাচীন মিশরীয়দের মত এ যুগের লোকেরাও সম্ভবত বিশ্বাস করত যে এ জগতে মৃতের আত্মার উদ্দেশে যা দান করা হয়, পরলোকে আত্মা সে সমস্ত লাভ করে।

এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে প্রাচীন মিশরের কথা। মিশরে যখন আমরা ইতিহাসের দ্বারে এসে পৌছাই তখন পিরামিডের যুগ। সে যুগে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে মৃত্যুর পর মৃতের দেহ যতদিন থাকবে, তার ততদিন স্বর্গে বা পরলোকে বাস হবে। এই বিশ্বাস থেকেই আসে mummy করার প্রথা। এই প্রথায় মৃতদেহ যুগ যুগ ধরে অবিকৃত অবস্থায় থাকে। ক্রমে একটা অদ্ভুত ধারণা বদ্ধমূল হয় যে প্রত্যেক Pharaoh বা রাজা দেহান্তে স্বর্গে আবার নূতন জীবন লাভ করে এবং সেখানে সাধারণ মানুষের মতই তার চিরদিনের জন্য বাসস্থান। এই ধারণাকে কেন্দ্র করে ক্রমে ক্রমে পরলোকের চারিটি স্তর নির্ণীত হয়। প্রথম, স্বর্গ বা পরলোক কবরের মধ্যেই। এই বিশ্বাসের বশেই পিরামিডের নির্মাণ। কবর যেন সুন্দর এবং স্বর্গসদৃশ হয়। এর বেশ কিছুদিন পরে মিশরীয়রা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে যে পরলোক নক্ষত্রখচিত নীল আকাশের উপরে। সেখানে সব কিছুই সুন্দর ও মনোরম। পরে এর উপর আরও খানিকটা রং চড়ে এবং ধরে নেওয়া হয় যে স্বর্গে যে সব মনোরম কৃষিক্ষেত্র আছে, মৃতের আত্মা সেখানে চাষ-আবাদকে কেন্দ্র করে পরম আরামে বাস করে। পরবর্তী যুগে আবার আর একজন প্রচার করতে থাকেন যে পরলোক মাটির তলায়। জগতে সূর্যাস্ত মানে সূর্যের মাটির নীচে

চলে যাওয়া। আমাদের যখন রাত পরলোকে তাহলে তখন দিন এবং আমাদের যখন দিন পরলোকে তখন ঘোর অন্ধকার।

অন্য সব জাতি-উপজাতির কথা ছেড়ে দিয়ে মিশরের ইতিহাসের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন যুগে পরলোক সম্বন্ধে কত উদ্ভট ধারণা স্থান পেয়েছে। নজীর আর না বাড়িয়ে আমরা বলতে পারি যে ভগবান যেমন মানুষের কল্পনার সৃষ্টি, পরলোকও ঠিক তেমনি তাই। যাঁদের কাছে বিরাট cosmic force ভগবান বা ঈশ্বর তাঁদের কাছে পরলোক সেই বিরাট শক্তিতে বিলীন হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধারণ মানুষ কিন্তু খোঁজে কোথায় আমার ভগবান, কোথায় আমার স্বর্গ। যখন সে কিছুই পায় না, তখন সে হয় নাস্তিক, Epicurian বা চার্বাকপন্থী। এরাও কম জ্ঞানী নয়। স্বর্গ কোথাও নেই, কোথাও নেই। ওমর খৈয়ম তাই বলেছেন—

তিমির পথের যাত্রী মোরা দীপ্ত আশার রশ্মি কই ?
মর্ত্যে হয়ে লক্ষ্যহারা স্বর্গপানে তাকিয়ে রই ॥
কর্ণে পশে দৈববাণী কোথাও যে নেই আলোক পথ।
অন্ধ নিয়ত চালিয়ে বেড়ায় ভাগ্যদেবীর বিশ্বরথ ॥

(শ্রীকান্তি ঘোষের অনুবাদ)

পরিশিষ্ট-ক

হিন্দুধর্মের বিবর্তন

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে হিন্দুধর্মকে দেখলে এর একটা বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। এই বৈশিষ্ট্যই যে কোন ধর্ম থেকে একে পৃথক করে রেখেছে। এর বৈশিষ্ট্য মানে এই নয় যে পৃথিবীর মধ্যে যত ধর্ম আছে তার মধ্যে এইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ; বা একমাত্র এই ধর্মই মানুষকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিয়ে যেতে পারে, অথবা মানবজীবনের যা কিছু কাম্য তা এই ধর্মের মধ্যেই পাওয়া যায়। হয়ত তা সত্য, কিন্তু অন্য ধর্মের মধ্যেও এই সত্যের সন্ধান নিশ্চয়ই মিলবে। এ ধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হল এই যে এর কোন প্রবর্তক বা prophet নেই। পৃথিবীতে অন্য যে সমস্ত বহুল প্রচারিত ধর্ম আছে তার প্রত্যেকটিরই একজন করে প্রবর্তক আছেন, যিনি মহামানব বা ভগবানের অংশবিশেষ বলে বিবেচিত। হিন্দুধর্মের কিন্তু কোন প্রবর্তক নেই। এই ধর্মকে কেন্দ্র করে ভারতে অনেক মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে, যাঁদের যুগাবতার বা যুগস্রষ্টা বলা যায়। কিন্তু তাঁরা বিভিন্ন যুগে এ ধর্মের মোড় ফিরিয়েছেন, একে নূতন পথে চালিত করেছেন মাত্র। এঁদের মধ্যে অনেকে নূতন মতবাদের প্রবর্তন করেছেন, নূতন সম্প্রদায় গড়ে তুলেছেন।

হিন্দুধর্মের বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে এটির অভ্যুত্থান হয়েছে সাধারণ লোকের মাঝে এবং সাধারণ চিন্তাধারার মাধ্যমে। সাধারণ লোকের মধ্যে এর অভ্যুত্থান হওয়ায় আমরা এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। এই ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে, যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে আছে ও থাকতে বাধ্য। তাই একদিকে আমরা যেমন পাই এই ধর্মের মধ্যে দর্শনের গভীর তত্ত্ব, জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, দেখি একে কেন্দ্র করে দর্শন জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছে, আবার অন্যদিকে দেখি একেই কেন্দ্র করে জড় হয়ে আছে একগাদা কুসংস্কার, অর্থহীন বিধিনিয়ম, যা মানুষের পঙ্কিল মনের পরিচায়ক ছাড়া আর কিছুই নয়।

হিন্দুধর্ম যদি হিন্দু জনসাধারণের কৃত বা মধ্যে প্রচলিত ধর্ম হয়, তাহলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে যে 'হিন্দু' শব্দটির দ্বারা কি বা কোন্ জাতিকে বোঝায়।

এখানে আমাদের যেতে হয় একটু ইতিহাসের পটভূমিকায়, শিলালিপির মধ্যে, যা হয়ত সাধারণের কাছে অতি নীরস বলেই মনে হবে। প্রাচীন ইরানের সম্রাট দরায়ুস তাঁর Hamadan, Persεpolis এবং Naksh-i-Rustam লিপিতে 'হিন্দু' শব্দের ব্যবহার করেছেন। 'হিন্দু' তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। জগতের মধ্যে এই প্রথম হিন্দু শব্দের ব্যবহার এবং এটি একটি দেশের সংজ্ঞা। আধুনিক পাকিস্তানের সিন্ধুই হচ্ছে এই হিন্দু। দরায়ুসের পুত্র জারাক্সিস তাঁর লিপিতেও এই হিন্দুর উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, শিলালিপি বা তাম্রলিপি কোন জায়গাতেই আমরা হিন্দু শব্দের উল্লেখ পাই না। এ থেকে কিন্তু এইটেই বোঝায় যে প্রাচীন ভারতীয়রা নিজেদের কোনদিনই হিন্দু বলেন নি। তাঁরা নিজেদের সব সময়েই ভারতবাসী, ভরতের সন্তান, জম্বুদ্বীপবাসী ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করেছেন। এই প্রাচীন ইরানীয়দের কাছ থেকে গ্রীক-লাটিন লেখকগণ 'হিন্দু' শব্দটি পান এবং তাঁরা এটিকে বিকৃত করে Ind বা India আখ্যায় ভারতবর্ষকে অভিহিত করেন। প্রাচীন চৈনিক লেখকেরা ভারতবর্ষের একটি আখ্যা দিয়েছিলেন সিন্-তু বা ই-ন-তু, যা হিন্দুরই রূপান্তর। তাহলে দেখ যাচ্ছে 'হিন্দু' শব্দটি ইতিহাসের একটি বিড়ম্বনা। 'সিন্ধু' নাম থেকে হয় 'হিন্দু' এবং তাই থেকে হয় India আর আজ আমরা নিজেদের পরিচয় দিই হিন্দু বা Indian বলে। প্রাচীন যুগের কোন মহর্ষি আজ যদি দেহ ধরে এ যুগে ফিরে আসেন, তিনি হয়ত শিউরে উঠবেন যখন তিনি দেখবেন তাঁর বংশধরেরা নিজেদের অভিহিত করছে বিদেশীদের দেওয়া একটি আখ্যায়। এ দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এ ধর্মের নাম হিন্দুধর্ম না হয়ে ভারতধর্ম হওয়া সমুচিত। এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। মহাভারতের মধ্যে শিবের যে সহস্র নাম আছে, কোন-কোন পুঁথিতে দেখা যায় যে তার মধ্যে একটি নাম 'হিন্দু'। কিন্তু পুণার ভাণ্ডারকর প্রাচ্য মহাবিদ্যালয় থেকে মহাভারতের বিভিন্ন পুঁথির যে তুলনামূলক শুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করা হয়েছে, তাতে আমরা দেখি প্রাচীন পুঁথিতে নামটি আছে 'সিন্ধুগ' যেটি অর্বাচীন পুঁথিতে হয়েছে 'হিন্দুগ'। ভারতবর্ষে হিন্দু শব্দের প্রথম উল্লেখ বিজয়নগর রাজ্যে "সত্যমঙ্গলম্" লিপিতে। এটি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে লেখা। এর পূর্বে ভারতবর্ষে কোথাও হিন্দু শব্দের কোন উল্লেখ নেই।

তাহলে যদি তথাকথিত হিন্দুধর্ম ভারতবাসীর ধর্ম হয়, স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে যে ভারতবাসী বলতে ঠিক কোন জাতিকে বোঝায়। এ প্রশ্নটি বিবেচনা করা প্রয়োজন, কারণ এ বিষয়ে আধুনিক এবং প্রাচীন যুগের পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। বিষ্ণুপুরাণের মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত বর্ণনাটি পাই :

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমবদ্দক্ষিণঞ্চ যৎ।
বর্ষং তৎ ভারতং নাম যত্রেয়ং ভারতী প্রজাঃ।

অর্থাৎ,সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমালয়ের দক্ষিণে যে বর্ষ বা দেশ তার নাম ভারতবর্ষ এবং সেখানকার প্রজা, অর্থাৎ জনসাধারণ ভরতের সন্ততি। এই বর্ণনাটির মধ্যে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

প্রথম, ভারত যে একটি দেশ এই জাতীয়তাবোধ প্রাচীন যুগে বিদ্যমান ছিল। অনেক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক এই কথাটি স্বীকার করতে চান না। তাঁরা বলেন যে ভারতের nationalism বা জাতীয়তাবোধ কোনদিন ছিল না এবং ভারতবাসীদের একটি জাতি বলা সমীচীন হবে না। রাজনৈতিক ইতিহাসের দিক দিয়ে বিচার করলে কথাটি খুবই সত্য। প্রাচীন বা মধ্যযুগে আমরা কখনও সমগ্র ভারতকে একই শাসনের ছত্রতলে দেখতে পাই না। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের উপরি-উক্ত বর্ণনা থেকে এইটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে রাজনৈতিক একতা না থাকলেও প্রাচীন ভারতবাসীদের মধ্যে একটা অদ্ভুত জাতীয়তাবোধ ছিল যেটা তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং কৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয়টি হল উদ্ধৃত বর্ণনায় সমস্ত ভারতবাসীকে একই গোষ্ঠীভূত করার একটা প্রচেষ্টা। সকলকেই বলা হয়েছে ভরতের বংশধর। আধুনিক নৃতত্ত্বের মাপকাঠিতে আমরা যে জাতিত্বের নির্দেশ করি, প্রাচীন ভারতীয়গণ সে নির্দেশনামা মানতে রাজী ছিলেন না। এ বিষয়ে তাঁদের মতবাদ ঠিক কি ভুল সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার করলে সমস্ত ভারতবাসীই এক বংশসম্ভূত একথা অবশ্যই কেউ স্বীকার করবেন না। এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক বাদ-বিতণ্ডা আছে। সে সব খুঁটিনাটির মধ্যে প্রবেশ না করে সাধারণ-গ্রাহ্য মতবাদটি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারতের প্রাচীনতম জাতি Negroid বংশসম্ভূত। এদের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেতে বসেছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন আদিবাসীর মধ্যে

Negroid রক্ত বর্তমান—এরকম একটা ধারণা অনেক মনীষীই করে থাকেন। কারও কারও মতে আমাদের নাগাদের মধ্যেও এই রক্তের নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে এ মতটি সর্ববাদীসম্মত নয়। এই আদিম জাতি পরবর্তী যুগের ভারতীয় সভ্যতাকে কতটা প্রভাবিত করেছে, তা সত্যই নির্ণয় করা কঠিন। এর পর অতি সুপ্রাচীন যুগে একদল নূতন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এদের বলা হয় Proto-Australoid বা Austric। আধুনিক সাঁওতাল, গণ্ড, মুণ্ডা প্রভৃতি যে সব আদিবাসী আমরা দেখতে পাই তারা সবাই এই Proto-Australoid বংশসম্ভূত। এই জাতির অস্তিত্ব শুধু ভারতে নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত পলিনেশিয়া ও মেলা-নেশিয়ায় এবং অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে আজও বিদ্যমান। এদের একটা নিজস্ব কৃষ্টি এবং চিন্তাধারা সব সময়েই দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় সভ্যতায় এদের দান প্রভূত। মনীষী Sylvan Levi সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন যে ভারতের অনেক অঞ্চলের নাম এই Austric ভাষার অন্তর্গত, পরে তাদের সংস্কৃত রূপ দেওয়া হয়েছে। আমাদের বঙ্গ নামটিও এই তালিকার মধ্যে পড়ে। হিন্দুধর্মের অনেক কিছুই এদের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত। আমাদের যে পরজন্মে বিশ্বাস, যাকে কেন্দ্র করে আমাদের এতগুলি দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠেছে, তাও মূলত কিন্তু Austric, এবং বোধহয় আর্যদের দান নয়। তারপর আমরা যে গাছের পুজা করি, যেমন অনেক বাড়িতেই সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা তুলসীতলায় বাতি জ্বেলে করে, বেল, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বিভিন্ন গাছ আমাদের কাছে এত পবিত্র,—এইসব চিন্তাধারার উৎস খুঁজতে হয় অনার্য কৃষ্টির মধ্যে। এ নিয়ে পরে আমরা আরও বিশদভাবে আলোচনা করব। তবে একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার। আমাদের ভারতীয় সভ্যতার সবটাই হল গ্রামকে কেন্দ্র করে, যাকে বলা হয় rural culture; এই গ্রামকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীও এসেছে এই আদিবাসীদের কাছ থেকে।

হয়ত একটা সময় ছিল যখন Negroidদের বনেজঙ্গলে তাড়িয়ে অথবা তাদের একটা বিরাট অংশকে হত্যা করে এই Proto-Australoidরা ভারতে বহুযুগ ধরে বসবাস করে এসেছে। কিন্তু তাদেরও পতনের দিন হাজির হল যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করল দ্রাবিড় জাতি।

ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে দ্রাবিড় জাতীয় লোকেরা সুপ্রাচীন যুগে

ভূমধ্যসাগরের তীরে বাস করত এবং সেখান থেকেই তারা ভারতের দিকে এগিয়ে আসে। এখন তারা প্রধানত তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণে বসবাস করে। ভাষার দিক দিয়ে বিচার করলে এদের চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—তামিল, তেলুগু, মলয়ালম এবং কানাড়া। এই প্রসঙ্গে একটি অতি আশ্চর্যরকমের ভাষা লক্ষণীয়। এটি হল Brahui উপজাতির ভাষা এবং এরা বেলুচিস্তানের পার্বত্যময় এলাকার অধিবাসী। এই ভাষাটি আশ্চর্যজনক, কারণ ভাষা-তাত্ত্বিকগণ এই Brahui ভাষার সঙ্গে ভারতের সুদূর দক্ষিণে ব্যবহৃত তামিল ভাষার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। এ থেকে এইটেই প্রতীয়মান হয় যে, Brahui উপজাতি প্রাচীন দ্রাবিড় বংশসম্ভূত। ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে, বেলুচিস্তানের Bolan Passএর মধ্য দিয়েই দ্রাবিড় জাতি ভারতে আসে এবং সেই সময়েই তাদের একটি শাখা বেলুচিস্তানের পার্বত্য এলাকায় বসবাস স্থাপন করে—যারা আজ Brahui নামে পরিচিত—আর দলের অন্য লোকেরা ভারতের অভ্যন্তরে এগিয়ে চলে যায়।

এই প্রসঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার কথা স্বভাবতঃই এসে পড়ে, কারণ অনেকের মতে দ্রাবিড়জাতীয় লোকেরাই এই সভ্যতার সৃষ্টিকর্তা। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীরা এই ধারণাই পোষণ করেন। সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত বিভিন্ন নিদর্শন থেকে আমরা কিছু কিছু তৎকালীন ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি এবং দেখতে পাই যে পরবর্তী যুগে এর অধিকাংশই হিন্দুধর্মের একটা বড় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বপ্রথম চোখে পড়ে এখানে আবিষ্কৃত লিঙ্গাকৃতি দ্রব্যগুলি। পরে এগুলি অবশ্য শিবলিঙ্গে পরিণত হয়েছে। আরও দেখতে পাই কতকগুলি ring-stones যেগুলিকে যোনি বলে কল্পনা করা যায়। পরবর্তী যুগে সম্ভবত এইগুলিই হয় গৌরীপট্ট। এই প্রসঙ্গে কতকগুলি শিলমোহরের উপর যে ছবি অঙ্কিত আছে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

(১) একটি মোহরে আমরা দেখতে পাই 'যোগাসনে উপবিষ্ট ঊর্ধ্বলিঙ্গ শৃঙ্গবিশিষ্ট এক দেবমূর্তি ; চতুষ্পার্শে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার মহিষ এবং অধোদেশে মৃগ খোদিত'। এটি আদিম শিবের মূর্তি, যিনি মহাযোগীশ্বর এবং পশুপতি। আদিম শিব, কারণ পরবর্তী যুগে বৈদিক রুদ্রশিবের সঙ্গে এই দেবতাটি এক হয়ে মিশে গিয়েছেন। তখন অবশ্য দেবতার শিঙের আর অস্তিত্ব নেই, সেটি ত্রিশূলে পরিণত হয়েছে। এই শিলমোহরটি থেকে আমরা আরও

একটি বিষয় জানতে পারি। আর্যদের আগমনের পুর্বে যোগ ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। পরবর্তী যুগে হিন্দুধর্মকে এটি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। এইরকম 'যোগাসনে উপবিষ্ট' চিত্রখোদিত আরও কয়েকটি শিলমোহর মোহেঞ্জোদড়ো থেকে পাওয়া গেছে।

(২) সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত তুটি শিলমোহর সে যুগে মাতৃপূজার নিদর্শন। প্রথমটির একদিকে আমরা দেখতে পাই একটি স্ত্রীমূর্তি মাথা নীচু করে এবং পা তুটি উপরে দিয়ে শায়িতা এবং তার গর্ভ থেকে একটি গাছ বেরিয়ে আসছে। এ থেকে বোঝা যায় যে সে যুগে ভূমাতার উপাসনা প্রচলিত ছিল। হিন্দু-ধর্মের মধ্যেও আমরা এই ভূদেবীর উপাসনা দেখতে পাই এবং সেই ভূদেবীকে আদ্যাশক্তির একটি রূপ হিসাবেই কল্পনা করা হয়েছে। অম্বুবাচীর কল্পনা এইটেই প্রমাণ করিয়ে দেয়। অপর মোহরটিতে আর একটি সুন্দর ছবি খোদাই করা। দ্বিধাবিভক্ত অশ্বত্থ বা পিপ্পল গাছের ডালের উপরে একটি স্ত্রীমূর্তি, নীচে একটি লোক একটি ছাগলকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং পাশে আরও কতকগুলি লোক দাঁড়িয়ে আছে। এ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে ঐ দেবীমূর্তির সামনে ছাগবলি দেবার জন্য সকলে সমবেত হয়েছেন।

সিন্ধু উপত্যকায় মাতৃপূজার যে সকল নিদর্শন পাওয়া গেছে তা নিয়ে আমাদের অতি সতর্কভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। মনীষী Wheeler এ সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন: "A large number of the terra cottas represents females, and there has been perhaps an exaggerated tendency to regard these as a manifestation of the Great Mother Goddess, familiar in the religions of Western Asia and parts of Europe."

শক্তি উপাসনা পরবর্তী যুগে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে এবং পুর্বভারতেই শক্তিপুজার প্রচলন সমধিক। যদিও এর সঠিক কারণ নির্ণয় করা কঠিন, তাহলেও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করলে আমরা বিশেষ কয়েকটি তথ্যে গিয়ে পৌছতে পারি। আর্য উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে স্ত্রীদেবতাকে সর্বপ্রধান স্থান দেওয়া হয় নি। ঋগ্বেদে দ্যাবাপৃথিবীর উল্লেখ যদিও আমরা দেখতে পাই, তাহলেও তাঁদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থান দেওয়া হয়েছে বলে বোঝা যায় না। প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা থেকে হিন্দুধর্মে মাতৃপুজার প্রচলন নিশ্চয়ই খানিকটা এসেছে, কিন্তু পুর্বভারতে সম্ভবত এটিকে এত শক্তিশালী করে

তুলেছে, Proto-Mongoloid প্রভাব। যেমন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ দিয়ে যুগে যুগে নানা জাতি এসে ভারতে বসবাস করেছে, তেমনি উত্তর-পূর্ব গিরিপথগুলির মাধ্যমে এসেছে বিভিন্ন Mongoloid জাতি যাদের আধুনিক বংশধরেরা হল এই অঞ্চলের পার্বত্য বিভাগের অধিবাসীগণ। এই Mongoloid চিন্তাধারা আমাদের ভারতীয় ধর্মকে কতখানি যে প্রভাবান্বিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের উপর সহজেই আমরা এর প্রভাব দেখতে পাই।

যাক্, আমরা আবার প্রাগৈতিহাসিক মোহেঞ্জোদড়োর কথায় আসি। এই প্রাগৈতিহাসিক সমাজে আমরা বৃক্ষপূজা এবং নাগপূজার নিদর্শন পাই, কিন্তু সবচেয়ে বেশী পাই জীবজন্তু পূজার নিদর্শন। আশ্চর্য হবার কিছু নেই; আমরা আজও শিবের বাহন বৃষের, গণেশের বাহন ইঁদুরের এবং বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের পূজা করি না কি? সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে জীবজন্তুর পূজা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী মহাশয়ের নিম্নলিখিত মন্তব্য অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য:

"বৃক্ষোপাসনা অপেক্ষা মোহেন-জো-দড়োতে জীবজন্তুর পূজা অধিকতর প্রসারলাভ করিয়াছিল বলিয়া স্যর জন মার্শাল অনুমান করেন। শীল-মোহরে খোদিত চিত্রে হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, বৃষ, মহিষ ও ঘড়িয়াল কুমীর প্রভৃতি জীবজন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রায় সকলগুলিরই পোড়া মাটির তৈরী প্রতিমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। প্রস্তর এবং ফায়েন্স (faience) নির্মিত জীবজন্তুও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত জীবজন্তুতে দেবত্ব আরোপ করা হইত বলিয়া স্যর জন মার্শাল মনে করেন।

"কোন এক অর্দ্ধনর-অর্দ্ধবৃষ মূর্তিকে এক শৃঙ্গী ব্যাঘ্রের সহিত লড়াই করিতে শীলমোহরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সুমেরুদেশীয় গিলগ্যামেশ (Gilgamesh) নামক বীরের সাহায্যকারী অর্দ্ধনর-অর্দ্ধবৃষ আকৃতি-বিশিষ্ট ইঅবনি (Eabani) মূর্তির অনুরূপ। সিন্ধু উপত্যকার নর-বৃষমূর্তি পৌরাণিক যুগের হিরণ্যকশিপু নিধনকারী নৃসিংহমূর্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পৌরাণিক ভারতীয়েরা যেমন নৃসিংহকে ভগবানের অবতার স্বীকার করিয়া পূজা করিতেন সেইরূপ সিন্ধু উপত্যকাবাসীরাও নর-বৃষমূর্তিতে দেবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিতেন বলিয়া মনে হয়।"

সিন্ধু সভ্যতা দ্রাবিড় জাতির কীর্তি, এই অভিমতটা যদি বাস্তব হয়,

তাহলে ভারতীয় সভ্যতা যে কতটা ঐ জাতির কাছে ঋণী তা সহজেই অনুমেয়।

দ্রাবিড়রা আসবার কিছু পরে ভারতে প্রবেশ করেন আর্যরা যাঁরা এই হিন্দুধর্মের কাঠামো গড়ে তুলেছেন। আর্যরা ঠিক কবে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন অথবা তাঁদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বহু মত দেখা যায়। আর্যদের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে আমরা তিনটি মত প্রধানত দেখতে পাই—মধ্য এশিয়া, রুশিয়ার দক্ষিণাংশ অথবা ইউরোপের কোন অংশ। এ নিয়ে শেষ কথা বলা এখনও পর্যন্ত বোধহয় সম্ভব হয় নি। পালি গ্রন্থ পপঞ্চসূদনীতে বলা হয়েছে যে ভারতের কুরুবংশ এসেছিলেন উত্তরকুরু দেশ থেকে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই উত্তরকুরুকে বলা হয়েছে—'পরেণ হিমবন্তম্', অর্থাৎ হিমালয়ের পারে। মহাভারতের মধ্যেও উত্তরকুরুর অবস্থান সম্বন্ধে যে বর্ণনা পাই তাতে মনে হয় যে এ দেশটি মেরু অর্থাৎ আধুনিক পামিরের উত্তরদিকে অবস্থিত ছিল। এ তথ্যগুলি থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে আর্যদের আদি বাসস্থান বোধহয় মধ্য এশিয়াই হবে। এ বিষয়ে অবশ্য আরও গবেষণার প্রয়োজন।

আর্যরা কোন সময়ে ভারতে আসেন তা নির্ণয় করতে গেলে প্রথমে আমাদের দেখতে হবে যে বেদ কবে রচিত হয়েছিল। যদিও বেদকে অনাদি বলা হয় তাহলেও এর একটা কাল নির্ণয় করবার চেষ্টা হয়েছে। বেদ অনাদি এই অর্থে যে, এর মধ্যে যে সব তথ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যে তত্ত্ব এবং জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, তা চিরন্তন সত্য—আর যা চিরন্তন সত্য তার আদিও নেই, অন্তও নেই। বেদ চারটি, ঋক্, সাম্, যজুস্ ও অথর্ব। এদের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, সুতরাং ঋগ্বেদের কাল ধার্য করতে পারলে আর্যরা কবে ভারতে এসেছিলেন তা নির্ণয় করা হয়ত অনেকটা সহজসাধ্য হবে। কিন্তু এখানেও পণ্ডিতদের মধ্যে প্রবল মতভেদ। কেউ বলেন এই কালটি খ্রীষ্টপূর্ব '৬০০০ অব্দ, আবার কেউ কেউ বলেন ৩০০০ বা ১৫০০। সম্প্রতি একটা মত দেখা যাচ্ছে যে ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এসব আলোচনার মধ্যে আমাদের প্রবেশ করবার কোন প্রয়োজন নেই। একটা জিনিস অবশ্য লক্ষণীয়,—ঋগ্বেদের মধ্যে আমরা আর্যদের সঙ্গে দাস-দস্যুদের যে যুদ্ধের বর্ণনা পাই তাতে দেখি যে এইসব দস্যুরা 'পুর' দখল করে আছেন এবং এগুলি বৃহৎ অট্টালিকা এবং দুর্গসমন্বিত। ঐতিহাসিকেরা

অনুমান করেন যে আর্যরা ভারতবর্ষে এসে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তাঁদের নির্মূল করে এই সিন্ধু উপত্যকা দখল করেন। ঋগ্বেদের বর্ণনায় আমরা দেখি যে এ যুদ্ধ তখনও শেষ হয় নি, যদিও পঞ্চনদ দেশ বা সপ্তসিন্ধু দেশ আর্যদের কবলিত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অন্যদিকে মোহেঞ্জোদড়ো ধ্বংসের সময় ১৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলে মনে করেন। সুতরাং এ থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে ঋগ্বেদ ১৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু কত আগে তা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়।

যাই হোক্, এই শ্বেতকায় আর্যজাতি ভারতবর্ষে এসে বসবাস করলেন কৃষ্ণকায় Proto-Australoid এবং Dravidian জাতির মধ্যে। তাঁরা এসে দেখলেন যে যদি চিরস্থায়ীভাবে এই ভারতে তাঁদের বসবাস করতে হয় তাহলে তাঁদের নিম্নলিখিত তিনটির ভিতর যে কোন একটি পথ বেছে নিতে হবে : প্রথমত, এই কৃষ্ণকায় জাতিদের নির্মূল করে হত্যা করতে হবে, অথবা এই সব জাতির কাছে তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করতে হবে, অথবা এদের সঙ্গেই মিলে মিশে একটা সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করে থাকতে হবে। আর্যরা এই তৃতীয় পথটিই বেছে নেন। তাঁরা আদিম কৃষ্ণকায় ভারতীয়দের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে আরম্ভ করলেন। সব দলের মধ্যে তাঁরাই অবশ্য প্রাধান্য লাভ করলেন। এই শ্বেতকায় বিজয়ীদের কাছে কৃষ্ণকায় বিজিতরা অবশ্যই খানিকটা বশ্যতা স্বীকার করে রইলেন।

ভারতের সভ্যতা বিশ্লেষণ করলে আমরা তাই দেখতে পাই যে, এর কাঠামো আর্য হলেও এর ভিতরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবদান রয়েছে। হিন্দুধর্মটাও ঠিক তাই। এটা আর্য, দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক প্রভৃতি জাতির ধর্মচিন্তা এবং ধর্মধারার সমন্বয়। তাই এই হিন্দুধর্মের মধ্যে আমরা প্রকৃষ্ট দার্শনিক তত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে সাধারণ ধর্মীয় কুসংস্কার সব কিছুই পাই। ভারতবাসীর সহনশীল মনোভাব এর কোনটাকেই অনাদর করে না। একজন ভারতীয়ের কাছে বেদান্তদর্শনের আলোচনা আর তুলসীতলায় প্রণাম, দুয়ের একই মূল্য। তাই হিন্দুধর্ম প্রচার করে যে সবারই লক্ষ্য এক, পথ হয়ত বিভিন্ন।

এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা যদি হিন্দুধর্মকে দেখি তাহলে দেখব যে পৃথিবীতে যত ধর্মের অভ্যুত্থান হয়েছে এর মত এমন উদারতা আর কোন ধর্মেই নেই। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন মতবাদকে এ শ্রদ্ধা দিয়ে এসেছে,

কখনও অপরের মতবাদ ঘৃণা করে নি বা নিজের মতবাদ জোর করে কারোর উপর চাপায় নি। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা দেখি যে প্রাচীন যুগে গ্রীক শক, হূণ প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে, ভারতভূমিকে তারা নিজেদের দেশ বলে গ্রহণ করে ভারতবাসী হয়ে গেছে। ঐতিহাসিকগণ এই কারণেই বলেছেন, India captured her captors. এটা কিন্তু সম্ভব হয়েছিল তদানীন্তন ভারতবাসীর উদারতার জন্য। একদিকে যেমন এইসব জাতি ভারতীয় কৃষ্টি গ্রহণ করে ভারতীয় হয়ে গেল, অন্যদিকে ভারতও তাদের সব কিছু নিজস্ব বলে গ্রহণ করে নিল। তাদের আচার-ব্যবহার, ধর্ম, রীতিনীতি সবই ভারতীয় বলে গণ্য হল। সুতরাং এটা কেউ কাউকে capture করা নয়, এটা হল একের সঙ্গে অপরের অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে যাওয়া। এই মিশে যাওয়ার ফলে এদের ধর্মচিন্তা এবং ধর্মীয় পদ্ধতির অনেক কিছু ছাপ এসে পড়ে হিন্দুধর্মের উপর। যদিও এসব নিয়ে পরে বিশদভাবে আলোচনা হবে, এখানে একটা সহজ এবং সরল দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। পশ্চিম ভারতের নানান জায়গা থেকে এক অপরূপ সূর্যমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তিটি দণ্ডায়মান, পায়ে হাঁটু অবধি বুট জুতা, গায়ে কোট। মথুরার কাছে মস্তকহীন রাজা কণিষ্কের যে মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তার সঙ্গে এ মূর্তির সাদৃশ্য আছে। এটি শকদের প্রভাবে ভারতে প্রচলিত সূর্যমূর্তি। এর সঙ্গে আমাদের রথস্থ সূর্যদেবের কোন সাদৃশ্য নেই। ভারতীয়েরা কিন্তু এ দুটি মূর্তিই সূর্যের বিভিন্নরূপ ধ্যানে পুজা করত। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে, 'শাকদ্বীপে তু বৈ বিষ্ণুঃ সূর্যরূপধরো মুনে'। এইভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের হিন্দুধর্মের মধ্যে বহু বিদেশীয় প্রভাব বিদ্যমান। এগুলি কি প্রমাণ করিয়ে দেয় না যে ভারতবাসীরা কত উদার, কত মহৎ, তারা পরকে কতটা আপন করে নিতে পারে?

যখন ভারতে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল তখন ইসলামের প্রভাবও এসে পড়ল হিন্দুধর্মের উপর। কবীর, দাদু, নানক, চৈতন্য, রামানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যে বাণী এবং ধর্মপ্রচার করে গেছেন তা হিন্দুধর্মের অঙ্গ হলেও তার উপর যথেষ্ট ঐসলামিক প্রভাব রয়েছে। আমাদের এই বাংলাদেশের কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কথাই ধরা যাক্। নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাকদহ গ্রামের সদ্‌গোপ বংশের রামশরণ পাল এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এঁরা প্রচার করতেন যে ঈশ্বর কর্তা অর্থাৎ এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারূপে জগতে

আবির্ভূত হয়েছেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিবিচার বলে কিছু নেই; দিনের মধ্যে পাঁচবার করে এই সম্প্রদায়ের মন্ত্র পাঠ করতে হবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। এদের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল এই যে মুসলমানদের মত শুক্রবার এদের কাছে অতি পবিত্র এবং সেই দিনটি বিশেষভাবে ধর্মচিন্তা এবং ধর্ম আলোচনায় অতিবাহিত করতে হবে। অন্যদিকে আবার মদ্য বা মাংস গ্রহণ করলে চলবে না, সকলকেই নিরামিষাশী হতে হবে। হিন্দুধর্ম এবং মুসলিমধর্মের এটি একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

মুসলিম রাজত্বের শেষদিকেই পাশ্চাত্যদেশীয়রা এদেশে আসতে আরম্ভ করেন। ক্রমে মুসলিম রাজ্যের পতন হল এবং বিভিন্ন পাশ্চাত্যশক্তির সংঘাতের মাধ্যমে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হল ইংরাজ রাজত্ব। ইংরাজরা প্রথমে ঠিক করেছিল যে ভারতীয়দের সামাজিক বা ধর্মসংক্রান্ত কোন ব্যাপারে তাঁরা হস্তক্ষেপ করবেন না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্যজগতের প্রভাবের ফলে এদেশের একদল লোক সামাজিক কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করবার জন্য তদানীন্তন সরকারকে অনুরোধ জানান। এর ফলে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে দেন এবং তাঁরই আমলে ইংরাজীর মাধ্যমে ভারতীয়দের শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়। এদিকে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ তাঁদের ধর্মের বাণী প্রচার করতে শুরু করেন এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে যে সমস্ত কুসংস্কার প্রবেশ করেছিল সেগুলি চোখের সামনে তুলে ধরেন। এর ফলে একদল খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। রাজা রামমোহন রায় এই প্রভাবের মধ্যে এসে পড়েন এবং একটি পুস্তিকা রচনা করেন যার নাম "The Precepts of Jesus—The Guide to Peace and Happiness." এই পুস্তকে তিনি বলেছেন, "Christianity is so admirably calculated to elevate man's ideas to high and liberal notions of one God...that I cannot but hope for the best effects from its promulgation in its present form."

উপরে উদ্ধৃতি থেকে আমরা তখনকার দিনের হিন্দু সমাজের আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ধর্মবিশ্বাসের একটা নমুনা পাই। তাঁদের উপর হিন্দুধর্মের প্রভাব ক্রমশঃই শিথিল হয়ে আসছিল এবং কবি মধুসূদনের মত অনেকেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। অন্যদিকে হিন্দুসমাজ এবং ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য গোঁড়াবাদীরা আরও কঠোর হয়ে উঠলেন যার ফলে আচার-বিচারই হল

প্রধান, মূল ধর্মটা গৌণ। প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া, হিন্দুসমাজ থেকে বহির্ভূত করা ইত্যাদি নিয়মের কঠোর প্রয়োগ চলতে লাগল। হিন্দুধর্ম তার প্রাচীন উদারতা, ভাবধারা সব কিছু বিসর্জন দিয়ে একটি পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে এসে পড়ল। ইতিহাসের দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হবে যে এই কঠোরতার তখন প্রয়োজন ছিল। এটা না হলে খ্রীষ্টীয় ধর্মের যে বন্যা মিশনারীরা বহাতে শুরু করেছিলেন তাতে হয়ত হিন্দুধর্ম ভেসে চলে যেত। অন্যদিকে আবার তখনকার পঙ্কিল অবস্থাটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। জিনিসটা কিরকম একটা উপমা দিলে বেশ বোঝা যাবে। নিদান সময়ে কবিরাজমশাইরা অনেক ক্ষেত্রেই সাপের বিষ দেওয়া ওষুধ দেন এবং তাতে মানুষের জীবনও রক্ষা করা হয়। কিন্তু তা বলে সেটা বিষই, অমৃত নয়।

যাইহোক্, রামমোহন রায় অচিরেই বুঝতে পারেন যে, খ্রীষ্টধর্ম এদেশের উপযোগী নয়। কিন্তু তদানীন্তন হিন্দুধর্মের প্রতিও তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। তখন তিনি বেদ এবং উপনিষদ পাঠ আরম্ভ করেন এবং প্রাচীন ভারতীয় দর্শনতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মসভা স্থাপন করেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্ম এবং খ্রীষ্টীয়ধর্মের মধ্যে যা কিছু ভাল তার সমন্বয় সাধন করা। এর ১৮ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৪৬ অব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে অবশ্য ব্রাহ্মরা বিভিন্ন দলভুক্ত হয়ে যায় কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে এই ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমেই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের একটা সমন্বয় ঘটাবার সুযোগ হয়েছিল।

পশ্চিম ভারতে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর সমসাময়িক হিন্দু সমাজের ঘোর বিরোধী ছিলেন, এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বৈদিক রীতিনীতি এবং বৈদিক সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তিনি মনে করতেন যে বৈদিক আচারব্যবহার থেকে আমরা দূরে সরে গেছি বলেই আমাদের অধঃপতন হয়েছে। হিন্দু যদি বাঁচতে চায়, তাকে আবার বৈদিক যুগে ফিরে যেতে হবে। তবেই সে বাঁচতে পারবে, নতুবা হিন্দুজাতি ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাবে।

হিন্দুধর্ম যখন পাশ্চাত্যের ঢেউ-এর প্রভাবে টলায়মান, হিন্দুসমাজ বহুধা বিভক্ত, সেই সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। পরমহংসদেব প্রচার করলেন সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী, 'যত মত তত পথ'—কিন্তু লক্ষ্য সকলেরই এক। তিনি নিজের

জীবন এবং আচরণের মধ্য দিয়ে দেখিয়ে গেলেন যে একেশ্বরবাদ, উপনিষদের দর্শন, বেদের মহিমা, এ সবের মধ্যে আর নৈবেদ্য এবং ফুল, ফল ও গঙ্গাজল দিয়ে মূর্তি পুজার মধ্যে এক নিগূঢ় সম্বন্ধ বিদ্যমান, কেউ কোনটার বিপরীত ধর্মাবলম্বী নয়। তিনি দেখালেন যে হিন্দুধর্মের মধ্যে যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে, সব স্তরেরই সমান মূল্য, কোনটাকে ছোট করা উচিত নয়। গীতার বাণী 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাস্তথৈব ভজাম্যহম্,' পরমহংসদেব এর সারমর্ম প্রচার করে গেলেন। দক্ষিণেশ্বরের সন্ন্যাসীর এই বাণী দেশবিদেশে ছড়িয়ে দিলেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য। হিন্দুধর্মের নবজীবন আরম্ভ হল।

এখন আমরা আবার আর একটা সন্ধিক্ষণে এসে পৌছেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারত স্বাধীন হয়েছে এবং বিভক্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান গবেষণার ফলে জগত আজ অনেক ছোট হয়েছে, অর্থাৎ এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাতায়াত আজ অতি সহজসাধ্য। এর ফলে ভারতে বিভিন্ন চিন্তাধারার ঢেউ এসে পৌছেছে। এ সবের মধ্যে দুটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, একটি সাম্যবাদের ঢেউ, আর অপরটি পাশ্চাত্যভাবের ঢেউ। এই বিভিন্ন ভাবধারার সংঘাতে হিন্দুধর্মের ভবিষ্যৎ রূপ যে কি হবে, তা অনুমান করা কঠিন। তবে, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে যখন সুপ্রাচীন যুগ থেকে হিন্দুধর্ম বিভিন্ন সংঘাতের মুখোমুখী হয়ে উপরের সামান্য আবরণ বদলে নিজস্ব মহিমা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে, তখন ভবিষ্যতেও তার মহিমা বজায় থাকবে। আবার প্রমাণিত হবে যে হিন্দুধর্ম সনাতন, এর আদিও নেই, অন্তও নেই।

হিন্দুধর্ম সাধারণলোকের ধর্ম, এটা people's religion; সুতরাং প্রশ্ন উঠতে পারে যে বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্মও হিন্দুধর্মের অন্তর্গত? এ দুটির প্রবর্তন করেছেন ভারতেরই মহামহিমময় সন্তান। আমাদের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে (The Constitution of India) কিন্তু এরকম একটা আভাস দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ২৫ ধারার ২য় উপধারার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে :

"Explanation II—In sub clause (b) of clause (2) the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jain or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly."

হিন্দুধর্মের তত্ত্বাবধায়ক ব্রাহ্মণেরা কিন্তু এ দুটি ধর্মকে কোনদিন ভাল চোখে দেখেন নি, কারণ এ দুটিই বেদবিরোধী ধর্ম। তবে তাঁদের আক্রমণটা বেশী ছিল বৌদ্ধধর্মের উপরেই। জৈনধর্ম হিন্দুধর্মের সঙ্গে নিজেকে খানিকটা মানিয়ে নিতে পেরেছিল। জৈনধর্ম প্রসঙ্গে Mrs. Stevenson নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

"The character of Jainism was such as to enable it to throw out tentacles to help it in its hour of need. It had never, like Buddhism, cut itself off from the faith that surrounded it, for it had always employed Brahmins as its domestic chaplains, who presided at its birth-rites, and often acted as officiants at its death and marriage ceremonies and temple worship. Then, too, amongst its chief heroes, it had found riches for some of the favourites of the Hindu pantheon, Rama, Krishna and the like. Mahavira's genius for organisation also stood Jainism in good stead now, for he had made the laity an integral part of the community, whereas in Buddhism they had no part nor lot in the order. So, when storms of persecution swept over the land, Jainism simply took refuge in Hindusim, which opened its capacious bosom to receive it ; and to the conquerors it seemed an indistinguishable part of that great system."

কোনদিনই এই রকম একটা আপসের মনোভাব বৌদ্ধরা কিন্তু দেখায় নি। আমরা মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনেক মূর্তি দেখতে পাই, যাতে দেখি বৌদ্ধ দেব অথবা দেবী একজন হিন্দু দেবতাকে পদদলিত করছে। বৌদ্ধ রাজা অশোক বারবার পরমতসহিষ্ণুতার উপরে জোর দিয়ে গেছেন, কিন্তু পরবর্তীযুগের বৌদ্ধরা এ সহনশীলতা দেখায় নি। কাজেই বৌদ্ধদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যমতাবলম্বীদের মিলন ঘটা শক্ত হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণদের দিক থেকে মিশবার একটা চেষ্টা অবশ্যই হয়েছিল। মহাভারতের মধ্যে যে দেবীস্তোত্র আছে তার মধ্যে আমরা একটা কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা পাই :

জম্বু-কটক-চৈত্যেষু নিত্যং সন্নিহিতালয়ে।
ত্বং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাম্॥

এই যে এখানে বলা হয়েছে যে দেবী চৈত্যের নিকটে বাস করেন, এ

থেকেই প্রমাণিত হয় যে ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধদের সঙ্গে কিছুটা মিটমাট করতে চেয়েছিলেন। অগ্নিপুরাণে বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর এক অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য এটাও ঠিক যে আর একদল লেখক বৌদ্ধধর্মের নিন্দাবাদও করেছেন। যেমন ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে :

তত: কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধনামাঞ্জনসুত: কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥

যার দোষেই হোক এ দুটি ধর্ম বরাবরই বিপরীতমুখী থেকে গেছে, যদিও সে ভাবটা আজ আর নেই। সারনাথে গিয়ে অথবা বুদ্ধগয়ায় গিয়ে হিন্দুরা আজ ভগবান তথাগতর চরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হবে কেন হিন্দুধর্মকে বলা হয় সনাতন এবং কেন এর মধ্যে যুগপৎ আমরা দেখি গভীর দার্শনিক তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা এবং পাশাপাশি কতকগুলি কুসংস্কারের সমষ্টি। দুই-এরই সার্থকতা প্রমাণিত করে এই মহান ধর্ম।

পরিশিষ্ট-খ

এশিয়ার ধর্মজীবনের আদিম রূপ

এশিয়ার আদিম মানুষ তার ধর্মজীবনের ইতিহাস লেখবার কোনই মাল-মশলা রেখে যায়নি। সামান্য যে দু-একটা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়, সেগুলি ইতিহাসের ক্ষেত্রে নেহাতই অকেজো। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে তাঁদের একটা নিজস্ব ধারা অনুসরণ করেন। আধুনিক যুগে যে সব আদিম-বাসী (অ্যাবওরিজিনালস) এশিয়ার নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে, তাদের ভাবধারার এবং রীতিনীতির তালিকা প্রস্তুত করে এবং সেগুলি পরস্পর তুলনামূলকভাবে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করেন। অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু দেখা যায় যে, এই ধরনের সিদ্ধান্তকে ইতিহাসের ধোপে টেঁকানো সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। কারণ, এই সব আদিবাসীদের অনেকেই কোন না কোন সময়ে সভ্য জাতির কিছুটা সংস্পর্শে এসে তাদের নিজস্ব রীতি-নীতির খানিকটা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। ভারতের একটি এইরকম আদিবাসীর কথাই ধরা যাক। ছোটনাগপুর অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে যে বিরহোর জাতি বাস করে তাদের কথা প্রথম যখন জানতে পারা গেল, তখন অনেক পণ্ডিতই মনে করেছিলেন, এদের মধ্যে আদিমতার ছাপ এত বেশী যে, এদের রীতিনীতির পর্যালোচনা করে আদিম মানুষ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জোগাড় করা যাবে। নূতন তথ্য এরা যে জোগায়নি তা নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও দেখা গেল যে, এদের মধ্যে রাম-সীতা প্রভৃতির পৌরাণিক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। এ থেকে এই অনুমান করাই স্বাভাবিক যে, যদিও অনেকাংশে এরা আদিম তবু এদের উপর খানিকটা সভ্য-জগতের ছাপ পড়েছে। তবে একথাও ঠিক যে আধুনিক যুগের আদিবাসীদের জীবনধারা আলোচনা করলে আমরা সেই সুপ্রাচীন যুগের ধর্মমতের খানিকটা প্রতিচ্ছবি পাব। কারণ, ধর্মমত এমন একটা জিনিস যে, এর বিশেষ কোনও একটা রূপ একবার গ্রহণ করলে মানুষ তাকে আর সহজে ছাড়তে চায় না এবং বংশানু-ক্রমে সেই একই মত চলে আসতে থাকে। এশিয়ার আদিমবাসীদের ধর্মমত আলোচনা করার আগে প্রাচীন যুগে এশিয়ার জনবিন্যাস সম্বন্ধে দু-একটা

কথা বলতে পারলে বিশেষ সুবিধা হ'ত। কিন্তু এ বিষয়ে পণ্ডিতদের এত মতভেদ যে, স্পষ্ট কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। আবার বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দলগুলির মধ্যে আন্তর্বিবাহ ইত্যাদির দ্বারা এমন একটা সংমিশ্রিত অথবা আর্য ঋষিদের ভাষায় "বর্ণসঙ্কর" জাতের উদ্ভব হয়েছে যে, এশিয়ায় বোধ হয় কোন লোকই আজ জোর করে একথা বলতে পারে না যে, সে একেবারে খাঁটি আর্য, অথবা দ্রাবিড়, অথবা মঙ্গোলীয় অথবা অন্য কিছু। কিন্তু বহু প্রাচীন যুগে এমন একটা দিন নিশ্চয়ই ছিল, যখন এই সব জাতির সংমিশ্রণ ঘটেনি। সেদিনের ছবি আজ মসীলিপ্ত, তার স্পষ্ট কোনও আভাসই আজ পাওয়া যায় না। কোনও কোনও নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিত মনে করেন যে, মানুষের ক্রমবিকাশের প্রথম যুগে এশিয়াতে তিনটি জাতি ছিল—শ্বেতকায় জাতি, যাদের বংশধরেরা আজ পশ্চিম এশিয়া, রুশ-তুর্কীস্তান এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসবাসী; পীতকায় জাতি যাদের অস্তিত্ব চীন-তুর্কীস্তান, মঙ্গোলিয়া. চীন, পূর্ব হিমালয় প্রদেশ, জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দেখা যায়, কৃষ্ণকায় জাতি যারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে, ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে আজও বাস করছে।

এইরকম বিভাগ যে কতটা রীতিসঙ্গত, তা নিয়ে কিন্তু পণ্ডিতদের মধ্যে দস্তুরমতো মতভেদ আছে। ভারতের কৃষ্ণকায় জাতির কথাই ধরা যাক। ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, এদের মধ্যে আমরা অন্তত তিনটি দলের সন্ধান পাই—

নিগ্রয়েড জাতি, যাদের বংশধরেরা আজ অনেকেই পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

অস্ট্রোলয়েড জাতি, যাদের বংশধর সাঁওতাল, কোল, ভীল, গণ্ড, ওঁরাও প্রভৃতি; এদের অস্তিত্ব এমন কি আন্দমান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে এবং মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া প্রভৃতি স্থানে দেখতে পাওয়া যায়।

দ্রাবিড় জাতি, যারা এখন ভারতে তামিল, তেলুগু, মলয়ালম প্রভৃতি ভাষা ব্যবহার করে।

তেমনি শ্বেতকায়দের মধ্যে আবার সেমিটিক আরব জাতি এবং ইরানী প্রভৃতি আর্যজাতি যে একই গোষ্ঠী থেকে উৎপন্ন, এ-কথাও অনেকে স্বীকার করেন না। এছাড়া তুর্কী-মঙ্গোল, উত্তর জাপানের আইনু প্রভৃতি জাতির সমস্যাও রয়েছে।

সুতরাং আমরা একথা ধরে নিতে পারি যে গায়ের রঙের ভিত্তিতে ভাগ করে এশিয়াবাসীদের মূল পূর্বপুরুষ নির্ধারণের চেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হবে। অন্যান্য পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যে মাপকাঠি ব্যবহার করেছেন, তা দিয়েও আমরা যে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব তা মনে হয় না।

এশিয়ার আদিম মানুষের ধর্মের ইতিহাস রচনা করতে গেলে আমরা শ্বেতকায় আর্য জাতি এবং পশ্চিম এশিয়ার সেমিটিক জাতিকে আমাদের তালিকা থেকে বাদ দেব। কারণ, আদিম যুগের সভ্যতার বিশিষ্ট কোনও নিদর্শনই এদের মধ্যে এখন পাওয়া যায় না এবং ইতিহাসের পটভূমিকায় এদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেখি যে, এরা সুসভ্য এবং বহুদিন পূর্বেই কোন অজানা অন্ধকারে এরা এদের আদিম অভ্যাসগুলি রেখে এসেছে। নিগ্রয়েড জাতি তাদের আদিম রীতি-নীতি ত্যাগ করেনি, কিন্তু আধুনিক যুগে এশিয়া ভূখণ্ডে এদের সংখ্যা এত অল্প যে, এদের ইতিহাসের কারখানাতে কোনই কাজে লাগান যায় না। দ্রাবিড় জাতিকে নিয়ে আবার মুশকিল অন্য দিকে। এরা সভ্যতার পথে অনেকদূর এগিয়ে গেছে এবং এদের ধর্মসম্বন্ধীয় রীতিনীতির মধ্যে কোনটা প্রাচীন এবং কোনটা অর্বাচীন, তা নিয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা আপাতত সম্ভবপর নয়।

সুতরাং এশিয়ার আদিমবাসীদের ধর্মমত সম্বন্ধে কিছু বুঝতে হলে সামান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছাড়া আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে সেই সব অস্ট্রোলয়েড, মঙ্গোলীয় এবং অন্যান্য অধিবাসীদের উপর, যাদের জীবনপ্রণালী এখনও সভ্যতার ছাঁচের আকার নেয়নি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এজাতীয় গবেষণা হবে একপেশে। কিন্তু উপায় নেই, রীতিমাফিক অগ্রসর হতে হলে এইভাবেই এগুতে হবে, তার ফল যত অকিঞ্চিৎকর, একঘেয়ে এবং সীমাবদ্ধ হোক না কেন।

ধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যাপারে আমরা জগতের সব আদিমবাসীর মধ্যেই একই ছাঁচের রীতিনীতি এবং চিন্তাধারা দেখতে পাই। এ থেকে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যেতে পারে যে, এগুলি অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। শুধু যে চলে আসছে তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে এই সব চিন্তাধারা সভ্য মানুষের চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে এবং তার ফলেই নূতন নূতন ধর্ম এবং দর্শনের তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। একটা বিষয় ধরা

যাক। প্রায় সব আদিবাসীরাই বিশ্বাস করে যে, চেতন ও অচেতন, স্থূল ও সূক্ষ্ম, সব জিনিসেই প্রাণশক্তি ও ঐশীশক্তি বিদ্যমান। এ শক্তি এত বিরাট এবং ব্যাপক যে, তার কাছে মানুষের মাথা নোয়ান ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এই শক্তিকে খুশী করতে পারলে জীবনের সব কিছু কাম্যই পাওয়া যাবে এবং বিরূপ হলে এই শক্তি আবার সর্বপ্রকারে ধ্বংস নিয়ে আসবে।

এই তথ্যের প্রতিচ্ছবিই আমরা পাই প্রহ্লাদের যে গল্প প্রচলিত আছে তার মধ্যে। প্রহ্লাদ তাঁর অবিশ্বাসী পিতাকে বার বার এই কথাই বোঝাতে লাগলেন যে, ভগবান সর্বভূতে বিরাজমান, এমন কি রাজপ্রাসাদের স্তম্ভের ভিতরেও। প্রহ্লাদের পিতা স্তম্ভকে আঘাত করতে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন নৃসিংহমূর্তি। এই নৃসিংহমূর্তির আবির্ভাব বিশেষ করে লক্ষ্য করবার বিষয়। কারণ, সর্ব দেশে সর্ব যুগে আদিমবাসীরা বৃক্ষ, প্রস্তর এবং বিভিন্ন জীবজন্তু পূজা করে থাকে। আবার কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে মানুষ এবং জন্তুর মিশ্রিত আকারের দেবদেবীর পূজা চলে। নৃসিংহমূর্তিটি যে এই রকম একটি শ্রেণীর অন্তর্গত, একথা পণ্ডিতেরা অনেকেই অনুমান করে থাকেন এবং এই মূর্তিটির মধ্যে আমরা আদিম এবং আর্যধর্মের একটি সমন্বয় দেখতে পাই।

চেতন-অচেতন নির্বিশেষে সব জিনিসই প্রাণবন্ত, এই যে সাধারণ বিশ্বাস আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত, সেটা ফুটে ওঠে তাদের গাছ, পাথর ইত্যাদি পুজার মাধ্যমে। পাঞ্জাবের কাঁকরা উপত্যকায় কিছুদিন পূর্বেও একটি পুরাতন গাছকে পুজা করা হত এবং প্রতি বৎসরই এই পূজায় একটি করে বালিকাকে বলি দেওয়া হত। মধ্য অস্ট্রেলিয়ার দিয়েরি উপজাতি বিশ্বাস করে যে তাদের পূর্বপুরুষরা গাছের মধ্যে বাস করছে এবং এই কারণেই কেউ গাছ কাটলে তারা বিশেষ রুষ্ট হয়। এই ধরনের বিশ্বাস ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। কোরিয়ার লোকেরা মনে করে যে, যে সব স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবের সময়ে প্রাণ হারায় অথবা যারা মহামারী কিংবা অপঘাত মৃত্যু বরণ করে, তাদের আত্মা গাছে গিয়ে বাস করে। এই কারণে কোরিয়ানরা মদ, কেক প্রভৃতি দিয়ে গাছের পুজা করে। সুপ্রাচীন যুগ থেকে চীনাদের মধ্যে কবরের উপর বৃক্ষ-রোপণ করার প্রথা প্রচলিত আছে। তাদের বিশ্বাস যে, এতে মৃতের আত্মা প্রসন্ন থাকবে। দক্ষিণ এবং পশ্চিম চীনদেশে মিয়াও-কিয়া নামে একটি উপজাতি বাস করে

এবং এদের প্রত্যেকটি গ্রামে ঢোকবার রাস্তায় একটি করে বড় গাছ থাকে। এরা বিশ্বাস করে যে, এই গাছে তাদের পুর্বপুরুষরা বাস করছে এবং তারাই তাদের ভাগ্যের নিয়ন্তা। যদি গাছের কোনও ডাল ভেঙে পড়ে, তাহলে এরা প্রথমে যথারীতি সেই ডালটির পুজা করে এবং পরে সেখান থেকে সেটিকে সরিয়ে ফেলে। সিয়াও-এর অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা যে, বনের ভিতরে নির্জন গাছের উপরে উপদেবতারা বাস করেন এবং পুর্ণিমার দিন তাঁরা গাছ থেকে নিচে নেমে আসেন। তাই পুর্ণিমা তিথিতে এরা বনের মধ্যে গিয়ে খুব ঘটা করে এই সব উপদেবতাদের পূজা লাগিয়ে দেয়। সুমাত্রার ম্যাণ্ডেলিং উপজাতীয়েরা গাছ কেটে এই সব উপদেবতাদের থামাকা রুষ্ট করার বিরোধী এবং এ বিষয়ে তারা ওলন্দাজ জাতিকে বিশেষ দোষ দেয়। এদের বিশ্বাস যে, ওলন্দাজরা এসে তাদের দেশের গাছ কেটে তাদের দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে। পশ্চিম এশিয়াতেও সুপ্রাচীন যুগে যে এই ধরনের প্রথা প্রচলিত ছিল, তার দু-একটা নিদর্শন পাওয়া যায়। হিব্রু এবং ক্যানা-নাইটরা সবুজ গাছের নীচে ভগবানের অস্তিত্ব বিরাজমান বলে স্বীকার করত এবং প্রাচীন বাবিলনের যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার মধ্যেও আমরা এই ধরনের বিশ্বাসের আভাস পাই। এখানে পাওয়া মোহরে এবং দেওয়ালের গায়ে আঁকা ছবিতে আমরা দেখতে পাই যে, গাছের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ পূজায় রত রয়েছে। কোন কোন পণ্ডিত পশ্চিম এশিয়ার এই নিদর্শনগুলির অন্যরকম ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু সেই সব পাণ্ডিত্যপুর্ণ ঐতিহাসিক কচকচির মধ্যে আমাদের না ঢোকাই ভাল।

আদিবাসীদের মধ্যে একটা ধারণা চিরদিনই বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, গাছের দেবতা রুষ্ট হলে বৃষ্টি দেওয়া বন্ধ করে দেন। উত্তর ব্রহ্মদেশে কোন কোন গ্রামের অধিবাসীরা বৃষ্টি নামাবার জন্য গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে তেঁতুলগাছ, তার ভিতরে অধিষ্ঠিত উপদেবতাকে জাঁকজমকের সঙ্গে পুজা করে। পুজার শেষে তিনজন স্ত্রীলোক বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে নেচে নেচে বৃষ্টির গান আরম্ভ করে দেয়। ভারতের বিভিন্ন আদিমবাসীদের বিশ্বাস যে, গাছের দেবতা খুশী থাকলেই উত্তম শস্য উৎপন্ন হবে। শুধু শস্য নয় গাছের দেবতা ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই মানুষকে দিতে পারেন। কিরগিজ উপজাতীয়দের মধ্যে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরা আপেল গাছের তলায় গিয়ে গড়াগড়ি দেয় এবং সন্তান কামনা

করে। আমাদের দেশেও ষষ্ঠীতলায় এই-রকম গড়াগড়ি দেবার প্রথা আছে।

বিভিন্ন গাছগাছড়ার পুজা আদিমবাসীদের কাছ থেকে সভ্য-সমাজেও প্রবেশ করেছে। আমাদের দেশে অশ্বত্থ, বট, বেল প্রভৃতি পবিত্র বৃক্ষ এবং প্রায়ই তাদের পুজা করা হয়। পল্লীগ্রামে দেখা যায়, সন্ধ্যার সময়ে মেয়েরা তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বেলে গলায় শাড়ির আঁচলটুকু জড়িয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করে :

তুলসী তুলসী নারায়ণ
তুমি তুলসী বৃন্দাবন

আদিম মানুষের গাছগাছড়ার পুজার সঙ্গে আর্যদেবতা নারায়ণের এই যে সংযোগ তা এই মহামানবের সাগরতীরে বৃহত্তর পরিধিতে আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণের একটা ছোট্ট নিদর্শন।

এইরকমভাবেই এই মিলনের যোগসূত্র ধরে সম্ভবত আমাদের বিভিন্ন দেবদেবীর বাহনের আবির্ভাব। আদিমবাসীরা জন্তু জানোয়ারের পুজা করত এবং তাদের সঙ্গে যখন আর্যদের মিলন হল তখন তাদের এই পশুরূপী দেবতাদের সঙ্গে আর্য দেবদেবীরও মিলন ঘটল।

অধিকাংশ আদিবাসীদের মধ্যেই এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, যেমন গাছগাছড়ার মধ্যে তেমনি জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও দেবতারা অথবা মৃত-লোকের আত্মা বাস করছেন। শুধু তাই নয়, এক একটি গোষ্ঠী যে এক একটি এইরকম জন্তুরই বংশধর এই ধারণাও তাদের মধ্যে বদ্ধমূল এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের সেই পশুরূপী পুর্বপুরুষের চিহ্ন বহন করে। এই ভাবধারাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা টোটেম সংজ্ঞায় অভিহিত করেছেন। এশিয়া ভূখণ্ডে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচীন যুগে সিংহ, হাতী, ভাল্লুক, ঘোড়া, ষণ্ড, কুকুর, শূকর প্রভৃতির পুজা হত। প্রাচীন পালি গ্রন্থের (নিদ্দেশ) বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, খৃষ্টপুর্ব চতুর্থ শতকে ভারতবর্ষে বহু পশুর পুজা প্রচলিত ছিল। এখনও আমরা দেখতে পাই বাঙলার সাঁওতালরা বাঘের পুজা করে এবং নাগা ও গণ্ডরা সাপের পুজা করে থাকে। কিছুদিন আগেও টোডারা ষাঁড়ের পুজা করত।

পুর্বেই বলেছি যে, মানুষ এবং পশুর মিলিত ছবি—নৃসিংহদেব যার প্রতীক—আদিমবাসীদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল। মধ্য অস্ট্রেলিয়ায় একদল

আদিবাসী বিশ্বাস করে যে, এইরকম একজন দেবতাই তাদের দেশ নির্মাণ করেছিলেন এবং তাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির প্রচলন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে চীনের ড্রাগনের কথা স্বভাবতঃই মনে হয়। চীনাদের ধারণা বাতাস, জল এবং পর্বতের উপদেবতা একত্রিত হয়ে এই অনেকটা সর্পাকৃতি ড্রাগনের মধ্যে বাস করছেন। এই দেবতাকে খুশী করতে পারলেই মানুষের সব অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। ড্রাগন নিয়ে অনেক আলোচনা পণ্ডিতদের মধ্যে হয়ে গেছে এবং সবিস্তারে সে-সব এখানে লেখা সম্ভব নয়।

আদিম মানুষ যেমন পশুদের পুজা করত, তেমনি আবার পশু বধ করতেও তারা দ্বিধা বোধ করত না। এই দুটি বিপরীতধর্মী ভাবধারার মধ্যে তারা একটা সামঞ্জস্য করারও চেষ্টা করেছিল। এর দু একটা উদাহরণ আধুনিক যুগের আদিবাসীদের আচার-ব্যবহার থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। কাম্বোডিয়ার একটি উপজাতি যে কোনো পশু হত্যা করার আগেই তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বলিদ্বীপে ধানচাষের সময়ে মাঠে বড় ইঁদুরের উৎপাত হয়। বলিদ্বীপবাসীরা ঝাঁকে ঝাঁকে ইঁদুরদের ধরে এবং তার পর তাদের হত্যা করে ঠিক যে ভাবে শবদাহ করা হয় সেইভাবে দাহ করে। কিন্তু ধৃত ইঁদুরের মধ্যে দুটিকে তারা রেখে দেয় এবং এই দুটিকে প্রথমে ভক্তিভাবে প্রণাম জানিয়ে পরে মাঠে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়।

দৃষ্টান্তের সংখ্যা এভাবে অনেক বাড়ান যেতে পারে। কিন্তু, মোট কথা হল এই যে, আদিবাসীরা একদিকে যেমন জীবজন্তুদের পুজা করে অন্যদিকে আবার তেমনি তাদের হত্যা করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। আধুনিক যুগে আমাদের মধ্যেও অনেকে আছেন, যারা ভক্তিভরে বিষ্ণুর মীন-অবতারকে প্রণাম জানান এবং তৃপ্তিভরে মৎস্য ভক্ষণ করেন। হ্যামের কথাটা আর তুলতে চাই না কারণ যারা হ্যাম খান, তারা হলেন আমাদের মতে নাস্তিক, ভগবানের বরাহ-অবতারের কথাটা একেবারে স্বীকার করেন না।

আদিবাসীদের মধ্যে এই একটা প্রচলিত ধারণা যে, পাথরের মধ্যে ঐশীশক্তি বিদ্যমান এবং তাই বিভিন্ন আকারের পাথর এবং পর্বত তাদের উপাস্য। আদিবাসীরা তাদের গ্রামের একটি নির্দিষ্ট স্থানে একখণ্ড পাথর রেখে দেয় এবং ভক্তরা যেমন শালগ্রাম শিলা বা শিবলিঙ্গের সামনে বসে তাদের ঈপ্সিত বস্তু লাভের আশায় প্রার্থনা জানায়, ঠিক তেমনি করেই তারা তাদের দেবরূপী শিলাখণ্ডের সামনে বসে তাদের প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন

করে। তারা আরও বিশ্বাস করে যে এই পাথর দিয়ে অনেক অঘটন ঘটান যেতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত এখানে দেব। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বোর্নিওতে একটি উপজাতির মধ্যে কোনো নারীর প্রসববেদনা উপস্থিত হলে একজন ওঝা ঘরের বাইরে পেটে একটি পাথর বেঁধে শুয়ে পড়েন, তাঁর যেন প্রসব-বেদনা হয়েছে, এই ভাণ করে। পরে তিনি পাথরটিকে আস্তে আস্তে পেট থেকে নামিয়ে দেন, এবং এরা বিশ্বাস করে যে, এতেই রমণীটির নির্বিঘ্নে প্রসবকার্য সমাধা হবে। আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে যে গ্রহরত্ন ধারণের ব্যবস্থা আছে তাকে এইরকম ধারণারই একটু উন্নত সংস্করণ বলা যেতে পারে।

পর্বতমালা চিরদিনই আমাদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। আমাদের মধ্যে বোধহয় এমন কেউই নেই, পর্বতের দৃশ্যে যার মন একটা অব্যক্ত চিন্তাধারায় হিল্লোলিত না হবে। প্রাচীন যুগে আদিম মানুষের মনেও ঠিক এইরকম হিল্লোলের সৃষ্টি হত। তাই ব্যাবিলন দেশের একর, আরবদের অরফত, হিব্রুদের নেবোকার্মেল এবং হারমন পবিত্র পর্বত। প্রাচীন যুগে চীনদেশেও পাঁচটি পবিত্র পর্বতমালার নাম আমরা পাই :

(১) সানটঙ্-এর তাই-সান্
(২) সেন-সির হুয়া-সান্
(৩) সান্-সির হেঙ্-সান্
(৪) হু-নান্ এর নান্-য়ো-সান্, অথবা হেন্-সান্
(৫) হো-নান্ এর সুঙ্-সান্

এই সব পবিত্র পর্বতমালার অস্তিত্ব কতখানি আদিবাসীদের কাছ থেকে সভ্য মানুষ পেয়েছে তা নির্ণয় করা কঠিন, তবে এবিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত যে আদিমবাসীরা নিশ্চয়ই পর্বতমালায় দেবতার অধিষ্ঠানে বিশ্বাস করত এবং পর্বতের পুজা করত। এ পুজা আমরাও করে থাকি। নগাধিরাজ হিমালয় আজও আমাদের কাছে পুজনীয়।

একটা প্রশ্ন নিয়ে গবেষকরা প্রায়ই মাথা ঘামান। আদিম মানুষের মধ্যে কোনো প্রধান দেবতা (সুপ্রীম গড) সম্বন্ধে ধারণা ছিল কিনা। আফ্রিকার পিগমিদের মধ্যে এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে এই রকম ধরনের একটা বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়। তারা মনে করে যে, প্রথমে এই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা এই জগতেই ছিলেন এবং তিনিই প্রথম মানুষকে আচার-ব্যবহার এবং রীতিনীতি শিক্ষা দেন। পরে এই প্রধান দেবতা আকাশের

উপরে চলে যান এবং সেইখানে তিনি এখনও বাস করছেন। তিনি আদি, অনন্ত এবং স্বয়ংসৃষ্ট। কোনো কোনো উপদলীয়দের মধ্যে এই আদিদেবতার উদ্দেশ্যে পূজা ইত্যাদি করা হয়, কিন্তু বেশীর ভাগ আদিমবাসীরই বিশ্বাস যে তিনি নির্লিপ্ত। মানুষ কি করছে না করছে তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। মানুষের ভালমন্দ দেখবার জন্য এবং তাদের ভাল কাজের পুরস্কার এবং খারাপ কাজের শাস্তি দেবার জন্য কতকগুলি একটু নীচু স্তরের দেবতা, উপ-দেবতা বা অধিদেবতা আছেন এবং আমরা যদি এদের স্তবস্তুতির দ্বারা তুষ্ট করতে পারি তাহলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সাংখ্যদর্শনের মধ্যেও আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, এই ধরনের একটা চিন্তাধারা দেখতে পাওয়া যায়। পরমাত্মা হলেন নির্বিকল্প, তিনি কিছুতেই লিপ্ত নন। আর ব্রহ্মা ইত্যাদি দেবতারা হলেন জন্যেশ্বর, তাঁর নিচে। ঠিক এই ধরনের পরিকল্পনা আদিম মানুষের ক্রম-বিকাশের কোন্ স্তরে এসে হাজির হয়েছিল, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কাজটা পণ্ডিতদের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

পল্ র‍্যাডিন এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণার পর বলেছেন :

"As far as our present actual knowledge goes, it can be said that the most typical instances of an aboriginal belief in a supreme Deity are to be found among the simplest and among the most complex of primitive civilisations."

খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা প্রথম যখন চীনে আসেন, তখন তাঁরা প্রাচীন চৈনিক সাহিত্যে দুটি শব্দ দেখে আশ্চর্য হয়ে যান,—সাং-তী এবং তিয়েন। প্রথম শব্দটির অর্থ হল প্রধান শাসক বা দেবতা এবং দ্বিতীয়টির অর্থ স্বর্গ। এ থেকে স্বভাবতই এই অনুমান করা যেতে পারে যে প্রাচীন চৈনিকদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে স্বর্গে একজন প্রধান দেবতা বাস করেন। ঠিক অনুরূপ ধারণা আমরা দেখতে পাই আন্দামানবাসী এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যে।

নিম্নস্তরের দেবতারা বেশীর ভাগই প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ। আন্দামান দ্বীপের উপজাতিদের মধ্যে আছে এইরকম দুটি দেবতা—বিলিকা ও টেরিয়া। টেরিয়া হলেন বৃষ্টির দেবতা এবং বিলিকা ঝড়ের দেবী, সাগরে ঘেরা আন্দামান দ্বীপবাসীর কাছে ঝড় ও বৃষ্টি, এ দুটোই হল প্রকৃতির প্রধান রূপ

এবং এ দুটো রূপেরই তাই তারা পুজা করে। উত্তর চীনের আদিবাসীদের মধ্যে এইরকম পাঁচটি প্রাকৃতিক দেবদেবীর সন্ধান পাওয়া যায়—বৃষ্টির দেবতা, মেঘ এবং বজ্রের দেবতা, নদী এবং পর্বতের দেবতা, গাছগাছড়ার দেবতা এবং মৃতের দেবতা। চীনারা নৃত্য এবং সঙ্গীতের দ্বারা এই সব দেবতার পুজা করে থাকে। উত্তর চীনের সেন্-সি প্রদেশে গেলে এরকম ধরনের পুজা আজও দেখতে পাওয়া যায়।

আদিম মানুষ এই সব দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বিভিন্ন উপায় নির্ধারণ করেছিল। তার মধ্যে প্রধান হল—ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিকের আশ্রয় গ্রহণ, পশুবলি এবং পুজা এবং কতকগুলি বিশেষ বিধিনিষেধ মেনে চলা।

ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিকের ব্যবহার প্রায় সব আদিবাসীদের ভিতরই দেখা যায়। এর জন্য বিশিষ্ট ক্রিয়াপদ্ধতি তারা অনুসরণ করে এবং তাদের নিজস্ব মন্ত্রও আছে। এর সাহায্যে তারা দেবতাদের সঙ্গে দরকার হলে লড়াই করে তাদের পরাস্ত করবার চেষ্টা করে, আবার দরকার হলে তাদের তোষামোদ করে। এইরকম ইন্দ্রজালের প্রভাব প্রাচীন আর্য ঋষিদের উপরেও পড়েছিল এবং বোধহয় এই বিশ্বাসকেই কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল অথর্ববেদ।

এই ইন্দ্রজালবিদ্যায় পারদর্শী একদল লোক আদিম সমাজের ভিতর বিশেষভাবে সমাদৃত হত। কোনো অসুখবিসুখ হলে অথবা কোনো বিপদ এসে হাজির হলে এদের ডাক পড়ত এবং এরা স্বীয় শক্তিবলে মানুষকে এই সব বিপদ থেকে উদ্ধার করত। আদিম সমাজের একাধারে এরা গুরু এবং চিকিৎসক।

আদিম মানুষেরা প্রায়ই লক্ষ্য করত যে, এইসব ইন্দ্রজালের সাহায্য নিয়েও তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হচ্ছে না। তখন তারা এইসব দেবতার পুজা, স্তবস্তুতি আরম্ভ করত এবং নিজেরা যে সমস্ত জিনিস ভালবাসে, দেবতাদের খুশী করবার জন্য সেইসব দান করত। তাদের ধারণা ছিল, দেবতারা ঐ সব জিনিসই ভালবাসেন এবং ঐ সব পেলে তাঁরা খুশী হবেন। মাংস আদিম মানুষের কাছে বিশেষ প্রিয়, তাই তারা পশুবলি দিয়ে দেবতাদের খুশী করবার চেষ্টা করত। এ সবের জন্য একটা বিশিষ্ট স্থান নির্বাচিত হত এবং পরবর্তী যুগে এরই সুসভ্য সংস্করণ হল বিভিন্ন স্থানে মন্দির ইত্যাদির নির্মাণ।

বলির ব্যাপারে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রথা দেখা যায়। উত্তর

চীনে আদিবাসীদের মধ্যে মানুষ বলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালের চীনা পুস্তকে এই প্রথাকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে, বলি মানুষের মঙ্গলের জন্য ; মানুষকে যদি বলি দেওয়া হয় তবে সে মঙ্গল ভোগ করবে কে ? পরবর্তী যুগে আমরা প্রথম সন্তানকে বলি দেওয়ার প্রথা দেখতে পাই, বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ায়। এর তাৎপর্য,—বৃক্ষের প্রথম ফল যদি দেবতার প্রাপ্য হয়, মনুষ্যবৃক্ষেরও প্রথম ফল দেবতার প্রাপ্য।

অনেক রকমের বিধিনিষেধ, যেগুলোকে আজ আমাদের কাছে কুসংস্কার বলে মনে হয়—আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আদিবাসীরা এখনও বিশ্বাস করে যে, কতকগুলি জিনিস হচ্ছে মঙ্গলকারক এবং কতকগুলি অমঙ্গলকারক, পয়া বা অপয়া। যেমন একটা বিচিত্র ধরনের পাথর বা একটা হাড়ের টুকরা অথবা এই ধরনের কোনো জিনিসকে তারা প্রায়ই ঘরে রেখে দেয় এবং তাদের ধারণা এটি ঘরে থাকলে শত্রুনাশ হবে, শারীরিক সুস্থতা আসবে, গৃহে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ঘটবে। এরই একটু উপরের স্তরে গিয়ে সুসভ্য মানুষের মধ্যে আমরা দেখতে পাই কবচ, তাবিজ ধারণের বিধি। ইতিহাসের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এগুলি আদিম মানুষের অভ্যাসের সুসভ্য সংস্করণ ছাড়া কিছুই নয়। দৈনন্দিন জীবনেও এদের মধ্যে অনেক বিধিনিষেধ দেখা যায়। পূর্বে উল্লিখিত ছোটনাগপুর জঙ্গলের বিরহোর জাতির কথাই ধরা যাক। এদের ধারণা যে যদি কেউ আকাশে রামধনুর দিকে আঙুল তুলে দেখায়, তাহলে তার আঙুল হয় পচে যাবে নয় বেঁকে যাবে। সকাল-বেলা ঘুম থেকে উঠে কেউ এক চোখ দেখালে সেদিনটা খারাপ যাবে এবং সেদিন কোনো শিকার মিলবে না। এটা কাটাবার জন্য যে এক চোখ দেখিয়েছে তাকে দুচোখ বন্ধ করে আবার দুচোখ খুলে চাইতে হবে। কোনো শুভ কাজে বিশেষ করে শিকারে যাবার সময়ে বাড়ির দিকে পিছন ফিরে চেয়ে দেখা অমঙ্গলজনক। বাড়ির বাইরে কোনো ধাতুনির্মিত বাসন রাখলে তাতে বাজ পড়ার সম্ভাবনা। এইভাবে তালিকা বৃদ্ধি না করে এই কথাটা শুধু বলা যেতে পারে যে, এরকমের অনেক বিশ্বাসই এখনও পর্যন্ত আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। আমরা অনেকেই মুখে হাসি এবং ঠাট্টা করে বলি যে এগুলো কুসংস্কার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে আবার মেনেও চলি। অর্থাৎ সভ্যতার কামিজের ভিতর থেকে আমাদের অন্তরের আদিম মানুষ এখনও উঁকি দেয়।

আদিম মানুষ চাষবাসের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এই বিধিনিষেধ মেনে চলত। ব্রহ্মদেশে ধান না জন্মালে ধানক্ষেতে গিয়ে অনেকরকম পুজো করা হয়। পূব এশিয়ার আদিমবাসীরা বিশ্বাস করে যে, চাষের দেবতাকে খুশী করতে না পারলে ফসল ভাল হবে না। কোনো কোনো উপজাতিদের মধ্যে আবার প্রথা আছে যে, যেদিন মাঠে বীজ ছড়ান হবে, সেদিন ভূস্বামী তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে ঐ মাঠে রাত্রে বাস করবেন। এদের ধারণা যে এতে মাটির উর্বরতাশক্তি বেড়ে যাবে। আবার কোন কোন উপজাতি এর ঠিক বিপরীত মত পোষণ করে। যেদিন বীজ বপন করা হয়, সেদিন ভূস্বামী আর তার স্ত্রীকে একেবারেই স্পর্শ করেন না, কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেন। সময়ে সময়ে এই চাষবাসের বিধিনিয়ম যে কত ভয়াবহ আকার ধারণ করে তার দু একটি নমুনার এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিছুদিন আগেও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে চাষ করার আগে একটি করে মানুষ বলি দেওয়া হত। ভারতের পূর্ব সীমান্তে নাগাদের মধ্যে, ছোটনাগপুরে ওরাও এবং গণ্ড প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে চাষের পূর্বে মানুষ বলির প্রথা প্রচলিত ছিল। এগুলি এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

আদিম জাতিদের জীবনের যত সব বাধানিষেধ, যাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা 'ট্যাবু' সংজ্ঞায় অভিহিত করেন, তার মূলে রয়েছে সেই চিরন্তন বিশ্বাস, যে একটা অদৃশ্য শক্তি সর্বদাই আমাদের বাহিরে কাজ করছে এবং আমাদের সব সময়েই সতর্ক হয়ে চলতে হবে পাছে সেই শক্তি আমাদের উপর বিরূপ হয়। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এর নাম দিয়েছেন 'বিলিফ ইন মানা'। মানা শব্দটি মেলানেশীয় জাতিরা ব্যবহার করে এই শক্তিকে বোঝাবার জন্য, এবং এই শক্তির তুষ্টিবিধানার্থে যত বিধিনিষেধের উৎপত্তি। কোনো কোনো আদিবাসীদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, শিকারী, জেলে, হত্যাকারী, নবজাত শিশু, সদ্যবিধবা নারী প্রভৃতি অস্পৃশ্য। এই ধরনের অস্পৃশ্যতা আমাদের ধর্মশাস্ত্রেও দেখতে পাই এবং তার জন্য আমরা অভিশাপ দিই পূর্বতন ব্রাহ্মণদের, যে তাঁরা অস্পৃশ্যতা দেশে ঢুকিয়ে জাতির সর্বনাশ করে গেছেন। এখন একটু ভাল করে দেখলেই বোঝা যাবে যে যদিও অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা অস্পৃশ্যতাকে নিজেদের কাজে লাগিয়ে সুবিধা করে নেবার চেষ্টা করেছেন, মূলত কিন্তু এগুলি এসেছে আদিম সমাজ থেকে। আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণের ফলে অন্তত এই দিক দিয়ে যে অনার্যরা

আর্য ঋষিদের প্রভাবান্বিত করেছিল, আশা করি প্রত্যেক ঐতিহাসিকই তা স্বীকার করবেন।

এই সমস্ত বিধিনিষেধ পুরাপুরি ভাবেই মেনে চলতে হবে এবং যদি কেউ তা লঙ্ঘন করে সে যে শুধু নিজের বিপদই ডেকে আনবে তা নয়, সমগ্র গোষ্ঠীই মহা বিপদে পড়বে। তাই এসব বিধিনিষেধ ভঙ্গ করলে কঠোর শাস্তির এমন কি মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা আদিবাসীদের মধ্যে হয়ে থাকে। গ্রামের মোড়লরা যেমন এসে বিচার করে তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, উপজাতীয়-দের মধ্যে ঠিক সেইরকম ভাবেই দলপতি এসে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করে থাকেন। শুধু এই বিধিনিষেধ ভঙ্গ করা নয়, অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ বা অস্পৃশ্য ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের দ্বারাও মহাপাপ অনুষ্ঠিত হয়, এই ছিল আদিবাসীদের ধারণা।

এইভাবে বিধিনিষেধ ভঙ্গকারীর দোষ মাফ করবার ব্যবস্থাও আদিবাসী-দের মধ্যে প্রচলিত আছে। তারা বিশ্বাস করে যে, উপবাস, মাথা কামান, নখ কাটা, জলে শরীর ভাল করে ধুয়ে ফেলা, ইত্যাদি উপায়ে মানুষ পবিত্রতা লাভ করে। রক্তের সঙ্গে শরীরের অপবিত্রতাও বেরিয়ে চলে যায় এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সময়ে সময়ে এরা নিজের দেহ কেটে রক্ত বের করে দেয়। একটা কথা এখানে মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে এদের মতে এই অপবিত্রতা নিজে থেকে আসে না, উপদেবতারা এই সব মানুষের দেহে সঞ্চারিত করে দেন। কাজেই এই সব বিধিনিষেধ এবং প্রায়শ্চিত্ত—আদিম মানুষের কাছে সবই ধর্মের একটা অঙ্গ।

সব যুগেই আমরা দেখতে পাই যে মৃত্যুর সঙ্গে ধর্মের একটা বিশেষ সম্বন্ধ বিদ্যমান। মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে, অথচ এ অনিবার্য ঘটনাকে এড়াবার কারও সাধ্য নেই। আজও আমরা একটি মৃতদেহ দেখলে মনের সঙ্গে স্বভাবতই একটু অস্বস্তি বোধ করি। এই মৃত্যুর ভয়কে আশ্রয় করেই ধর্মের একটা বড় দিক গড়ে উঠেছে।

সেই আদিম যুগের মানুষের ধর্মের উপরেও আমরা মৃত্যুর একটি বিশিষ্ট প্রভাব দেখতে পাই। যে আমাদের চির আপনার, স্নেহ অথবা ভক্তি দিয়ে যাকে আমরা এতদিন আঁকড়ে রেখেছি, এক মুহূর্তেই সে একেবারে পর হয়ে যাবে, একেবারে তার সব চিহ্ন লোপ পেয়ে যাবে, একথা আমরাও যেমন সহজে ভাবতে পারি না, তারাও ঠিক তেমনি ভাবতে পারত না।

তারা ভাবত যে, মৃতেরও একটা জগৎ আছে এবং মানুষ মৃত্যুর পর সেই জগতে গিয়ে বাস করে। আত্মার অস্তিত্বে এরা সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই আমরা এদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীতভাব ধর্মমতের অভ্যুত্থান দেখতে পাই। তার দু-একটা নিদর্শন এখানে দেব।

আদিম চীনাদের মধ্যে একটা সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পূর্বপুরুষের আত্মা তাঁদের বংশধরদের মঙ্গল কামনায় চিরদিনই ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এই আত্মাকে একটু খুসী করতে পারলেই এরা আমাদের অনেক উপকার করবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই চীনারা তাদের পূর্বপুরুষদের পূজা করে। এখনও এই পূজায় অনেকরকম জাঁকজমক হয় এবং প্রাচীন চীনা-গ্রন্থ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে যুগে এই সব পূজায় প্রায়ই পশুবলি দেওয়া হত। যুদ্ধযাত্রা করবার আগে রাজা এবং সামন্তেরা পূর্বপুরুষদের পূজা করতেন এবং তাঁদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতেন। পরবর্তী যুগে মধ্য-এশিয়ার ইউ-চি জাতির মধ্যেও এই প্রভাব বিস্তারিত হয় এবং তারা ভারতেও এই প্রথা প্রচলন করে। কুষাণ রাজাদের বিবরণীতে আমরা দেবকুলের উল্লেখ পাই যেখানে সম্ভবত পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতি রাখা হত এবং এই কুষাণ প্রভাব আমরা আরও লক্ষ্য করি কবি ভাসের "প্রতিমা-নাটকে"। প্রাচীন চীনা সাহিত্য থেকে আরও জানা যায় যে, প্রত্যেক দলপতিই তাঁর নিজের এলাকায় পূর্বপুরুষদের পূজার জন্য একটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করে রাখতেন এবং পরবর্তী যুগে এই সব স্থানে মন্দিরাদি নির্মাণ করা হয়েছিল। এইসব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজও ভূগর্ভ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা বার করছেন।

কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে আবার এই ধারণা ছিল যে, মৃতের আত্মা মানুষের ক্ষতিই করে থাকে। কবর থেকে এই আত্মা সুবিধা পেলেই বেরিয়ে পড়ে এবং তাকে বাগ মানাবার জন্য তখন নানারকম ধর্ম প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। আত্মা যাতে এইভাবে অনিষ্টসাধন না করতে পারে, তার জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা হত। আজকালকার আদিবাসীদের জীবন-প্রণালীর দু-একটা উদাহরণ এখানে দিচ্ছি। কোন কোন আদিবাসীর মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকে কখনও সোজা রাস্তা দিয়ে কবর দিতে নিয়ে যাওয়া হয় না। শববহনকারীরা আঁকাবাঁকা পথে চলে, কারণ এইভাবে আঁকাবাঁকা পথে চললে মৃতের আত্মা আর পথ চিনে ফিরে আসতে পারবে না। যাতে ফিরে এসে এরা কোন অনিষ্ট না করতে পারে, তার জন্য

এশিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে অনেকপ্রকার অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানগুলি বেশীরভাগই হয় মাঠ থেকে চাষের পর শস্য তোলার সময়ে, কারণ মৃতের আত্মা ভূত হয়ে তখন এই সব শস্যক্ষেতে আসে এবং এদের তাড়াতে না পারলে মানুষের যে বিপদ এসে হাজির হবে তা বলা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব ভারতের মুণ্ডারি জাতির মধ্যে এই ধরনের উৎসব দেখা যায়। হিন্দুকুশের বিশেষ করে চিত্রলের উপজাতিদের মধ্যে এই উৎসবকে বলা হয় "ভূত-তাড়ানো" উৎসব। ভারতের খন্দদের মধ্যে আবার এই রকম উৎসব হয় মাঠে বীজ বপন করবার সময়ে। বলিদ্বীপে নবম মাসের অমাবস্যায় এবং কাম্বোডিয়ায় মার্চ মাসে এ উৎসব হয়ে থাকে। থাইল্যাণ্ডে বছরের শেষ দিনে এইরকম একটা মজার অনুষ্ঠান হয়। রাজপ্রাসাদ থেকে একটি বন্দুক ছোঁড়ার মধ্য দিয়ে এই উৎসবের সূচনা হয়। তারপর কিছুদূর অন্তর অন্তর একটি করে বাড়ি থেকে বন্দুক ছোঁড়া হতে থাকে এবং এই একই পদ্ধতির অনুকরণ গ্রামের সর্বশেষ বাড়ি পর্যন্ত চলে। থাইবাসীদের বিশ্বাস যে এইভাবে ভূতকে গ্রামের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

এইসব আদিবাসীদের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, সব ভূতই কিন্তু ক্ষতি করে না। যে অপঘাতে মরেছে, যার আত্মা অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে চলে গেছে, যে অতি নিকৃষ্ট প্রণালীর জীবনযাপন করে এইরকম মানুষের আত্মাই ভূত হয়ে মানুষের অপকার করবার চেষ্টা করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই ধরনের চিন্তাধারা আজও আমাদের সুসভ্য সমাজে অনেকে পোষণ করেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এ জিনিসটি আমরা আদিবাসীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছি। দুষ্ট আত্মার দমন এবং শান্ত আত্মার তোষণ—এই দুটি চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে আদিমজাতীয়দের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ধর্মকর্মের প্রচলন হয়েছিল। আধুনিক জগতে ভূতের ওঝা ও শ্রাদ্ধের পুরোহিত এই দুটি ভাবধারারই পরিচায়ক।

উপরের আলোচনা থেকে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, এশিয়ার ধর্মজীবনের এই যে আদিম রূপ, এটা মানুষের চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে রয়েছে। ক্রমবিকাশের প্রথম পর্যায়ে ছবিটা কিরকম ছিল, সেটা আজ গবেষণার বিষয়। কিন্তু প্রামাণ্য তথ্যের অভাবে এ গবেষণার অনেকটাই হবে কাল্পনিক। সেটা ঠিক ইতিহাস হবে না, সেটা হবে কাব্য।